গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন

শিক্ষায় গবেষণা
Research in Education

BMED 2403

রচনা

প্রফেসর ড. মনিরা জাহান
প্রফেসর ড. শেখ মো: রেজাউল করিম
প্রফেসর মো: নজরুল ইসলাম
ড. মো: দিদার চৌধুরী
জি এম রাকিবুল ইসলাম

মূল্যায়ন

প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন
শাহ শামীম আহমেদ
মো: জাকির হোসেন

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. শেখ মো: রেজাউল করিম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষায় গবেষণা

BMED 2403

বিএমএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট- ২ (টিকিউআই- ২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই- ২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রনঃ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0105-2

মুদ্রণেঃ
মাস্টার সিমেক্স পেপার লি:
৬৫/২/১ বক্স কালবার্ড রোড
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায় পৃষ্ঠা

ইউনিট ১ : গবেষণার মৌলিক ধারণা ও শিক্ষা গবেষণা **০১-০৪**

- গবেষণার ধারণা, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য ১
- শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও প্রকৃতি ২
- শিক্ষা গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ৩
- শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ ৪

ইউনিট ২ : গবেষণার শ্রেণিবিভাগ **০৫-১৭**

- ঐতিহাসিক গবেষণা ৫
- বর্ণনামূলক গবেষণা ৬
- পরীক্ষামূলক গবেষণা ৭
- পরিমাণবাচক গবেষণা ৮
- গুণবাচক গবেষণা ৯
- মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা ১০
- জরিপ গবেষণা ১১
- কেস স্টাডি ১২
- কর্মসহায়ক গবেষণা ১২
- মৌলিক ও সামাজিক গবেষণার মধ্যে পার্থক্য ১৫

ইউনিট ৩ : গবেষণা পর্যালোচনা **১৮-২০**

- গবেষণা পর্যালোচনার ধারণা ১৮
- গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রক্রিয়া ১৯

ইউনিট ৪ : নমুনায়ন **২১-৩০**

- সমগ্রক, নমুনায়নের প্রকারভেদ ২১
- সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন ২৪
- নিয়মতান্ত্রিক/পদ্ধতিগত নমুনায়ন ২৫
- স্তরীভূত নমুনায়ন ২৬
- বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন ২৮
- নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ২৯
- উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ২৯

ইউনিট ৫ : উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও পদ্ধতি **৩১-৪৭**
- প্রশ্নমালা : ধরন ও ব্যবহার ৩১
- সাক্ষাৎকার : ধরন ও ব্যবহার ৩৫
- পর্যবেক্ষণ : ধারণা ও ব্যবহার ৪০
- FGD : প্রয়োগ পদ্ধতি, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ৪৩
- ডকুমেন্ট : ধরন, ডকুমেন্ট বিশ্লেষণে সর্তকতা ৪৬

ইউনিট ৬ : উপাত্ত বিশ্লেষণ **৪৮-১০৪**
- উপাত্তের ধারণা, গুরুত্ব, ধরন এবং বিশ্লেষণ কৌশল ৪৮
- কেন্দ্রীয় প্রবণতা ৫১
- বিস্তার পরিমাপ ৬৪
- সহ-সম্পর্ক ৭৮
- গুণগত গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ ৯৪

ইউনিট ৭ : গবেষণা প্রস্তাবনা **১০৫-১১৭**
- গবেষণা প্রস্তাবনার ধারণা ও সমস্যা সনাক্তকরণ ১০৫
- গবেষণার সমস্যা সনাক্তকরণ/চিহ্নিতকরণ ১০৭
- গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো ১০৮
- গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও গবেষণায় নৈতিকতা ১১২

ইউনিট ৮ : গবেষণা প্রতিবেদন **১১৮-১২৫**
- গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো ১১৮
- গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ১২১

ইউনিট-১ : গবেষণার মৌলিক ধারণা ও শিক্ষা গবেষণা

(Basic Concepts of Research and Education Research)

মানব জীবনের উন্নয়নে গবেষণার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। সমাজ ও সভ্যতা ক্রমশ সম্মুখের দিকে ধাবমান। অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং তার সত্যতা যাচাই করা, বর্তমানকে উদ্‌ঘাটন করা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করা এবং অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। শিক্ষাই জাতির উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি। কাজেই শিক্ষা তথা উন্নতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। দেশ ও জাতির দ্রুত উন্নয়নের জন্য মৌলিক গবেষণা অপরিহার্য। কারণ মৌলিক গবেষণার উপর ভিত্তি করেই অপরাপর গবেষণাগুলো পরিচালনা করতে হয়। গবেষণা ছাড়া কোনো জাতি ও দেশ তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারেনি। তাই বিশ্বের সচেতন দেশসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মহাকাশ ইত্যাদি সেক্টরে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে।

এ অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহ−
১.১ গবেষণার ধারণা, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য
১.২ শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও প্রকৃতি
১.৩ শিক্ষা গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
১.৪ শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ

১.১ : গবেষণার ধারণা, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

(Concepts of Research, goal and features)

গবেষণার ধারণা

কৌতূহল মানবমনের এক চিরন্তন প্রবৃত্তি। কৌতূহল সেই আদিম যুগ থেকে অদ্যাবদি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। আর সে কারণেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জীবন-জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে এত আগ্রহী। পারিপার্শ্বিক জীবন জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী। মানব মনে যেসব বহুমুখী প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে তার যথাযথ উত্তর লাভের আকাঙ্ক্ষায় গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ তথ্যসমূহকে যাচাই বাছাই করে নতুন জ্ঞান আহরণ করা ও প্রচলিত জ্ঞানের উন্নতি সাধনই গবেষণার কাজ।

শিক্ষাবিদ মৌলির মতে-পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সেই তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যখন কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান খুজেঁ পাওয়া যায় তখন সেই পদ্ধতিকে গবেষণা বলা হয়। শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক এর বিভিন্ন দিক, শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের অসঙ্গতি ও দুর্বলতার দিক অবলম্বনে শিক্ষা গবেষণার কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা আজকের দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে অনস্বীকার্য।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণে ইতিবাচক বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। গবেষণা ছাড়া সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। নিম্নে গবেষণার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেওয়া হলো:

- গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো কোনো নতুন সত্যের আবিষ্কার, এখন পর্যন্ত যার খোঁজ পাওয়া যায় নাই;
- কোনো ঘটনা বা বিবরণ সর্ম্পকে পরিচিতি লাভ;
- দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকরণ সর্ম্পক বের করা;
- পুরাতন তত্ত্বের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- ব্যাপকভিত্তিক সার্বজনীন গবেষণার মাধ্যমে গবেষণার সাধারণ নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করা।
- গবেষণার উদ্দেশ্যে গৃহীত সমস্যাটির অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কিনা যাচাই করা।
- সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

গবেষণার বৈশিষ্ট্য

- গবেষণা সব সময়ই কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত
- এটা হলো বুদ্ধিদীপ্ত ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান কর্ম
- গবেষণা কোনো তত্ত্ব বা মূলনীতি বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করে
- গবেষণা অনুমান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত
- গবেষণা তথ্য, উপাত্ত ও বর্ণনা নির্ভর
- গবেষণার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে গৃহীত হয়
- সংগৃহীত উপাত্ত যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা হয়
- গবেষণা কর্মের জন্য সূক্ষ্ম চিন্তন ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োজন
- গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়
- গবেষণা কার্যক্রমে নিরপেক্ষ, ধীরস্থির ও সাহসী হতে হয়
- গবেষণায় যৌক্তিক ধারাবাহিকতা প্রয়োজন
- গবেষণায় সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়

১.২ শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও প্রকৃতি (Concept of Education Research and Nature of Study)

শিক্ষা গবেষণার ধারণা

শিক্ষা গবেষণা হলো শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কীয় প্রক্রিয়াবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা। শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক অনুসন্ধানই হলো শিক্ষা গবেষণা। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বিরাজমান কোনো সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধান লাভের জন্য ব্যবহৃত গবেষণাও শিক্ষা গবেষণা। অতীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা করা হতো না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ধারণা ও কর্তৃপক্ষের প্রণীত নিয়মাবলিই ছিল সমস্যা সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার। পরিবর্তিত দ্বন্দ্বপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা গবেষণা করা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাসমূহ সমাধান করার প্রক্রিয়াকে শিক্ষা গবেষণা বলা হয়।

শিক্ষা গবেষণার প্রকৃতি

- শিক্ষা গবেষণা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে
- সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়
- শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন তথ্য, প্রত্যয় ও কৌশল নির্ধারণের জন্য শিক্ষা গবেষণা পরিচালিত হয়
- শিক্ষা গবেষণা পুন:অনুসন্ধান ও পুন:যাচাইযোগ্য
- শিক্ষা গবেষণা ব্যক্তিস্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হয়
- শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়
- প্রচলিত জ্ঞানের সাথে শিক্ষা গবেষণা শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন জ্ঞানের সংযোজন ঘটায়
- শিক্ষা গবেষণা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তথ্য নির্ভর।
- শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা তত্ত্বের সাধারণীকরণে বিশ্বাসী
- শিক্ষা গবেষণা শিক্ষা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য গঠন ও ভ্রান্ত তত্ত্ব বা তথ্য অপসারণে নিবেদিত
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে
- শিক্ষা গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষণার প্রতিটি বিষয়ই সচেতনভাবে ও যত্ন সহকারে রেকর্ড করা হয়
- শিক্ষা গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবকল্যাণে অবদান রাখে

১.৩ শিক্ষা গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

শিক্ষা গবেষণার উদ্দেশ্য

- শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান, তত্ত্ব ও সূত্র সৃষ্টি করা
- সমসাময়িক শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা
- শিক্ষাসংক্রান্ত আচরণীয় বিজ্ঞানের উন্নয়ন করা
- অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানের শিক্ষামূলক সমস্যাসমূহ সমাধান করা
- জনশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর পন্থা উদ্ভাবন করা
- শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ধারণা প্রস্তুত করা
- শিক্ষকের শিখন শেখানোর মান উন্নয়নে সাহায্য করা
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার উপর ঐতিহাসিক, সামাজিক, দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক যে প্রভাব রয়েছে তা বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষার সঠিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করা
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে বের করে নিয়ে আসা
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত সূত্র, তত্ত্ব ও জ্ঞানকে পূনঃর্মূল্যায়ন করা
- শিক্ষা সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করা
- জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা
- বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা গবেষণার গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং তার সত্যতা যাচাই করা, বর্তমানকে উদঘাটন করা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করা, অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজন। শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি ও সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা যায়। নিম্নে শিক্ষা গবেষণার কিছু গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

- শিক্ষা গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিকার ও উন্নয়নমূলক লাগসই বিভিন্ন বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন করে
- গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে
- শিক্ষা গবেষণা শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করে
- শিক্ষা গবেষণা দেশে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দান করে। তাই শিক্ষার সমস্যা নির্ণয় ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শিক্ষা গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।
- শিক্ষা উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত নীতি, কর্মসূচি পরিকল্পনা, প্রকল্প ইত্যাদি প্রণয়নে সাহায্য করে থাকে
- শিক্ষা গবেষণা অনুকূল জাতীয় জনমত গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে গণজনমত গঠনে সহায়তা করে
- শিক্ষা গবেষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় অবস্থান, নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মাত্রা নির্ধারণ করে এবং প্রচলিত জাতীয় সেবাদান ব্যবস্থা ও কলাকৌশলগুলোকে অধিকতর উপযোগী করে তোলে
- শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুনত্বের উদ্ভাবন ও সংযোজন, যুগোপযোগী সিদ্ধান্তগ্রহণ, নতুন প্রযুক্তিগত শিক্ষা উদ্ভাবন, শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির বহুমাত্রিক ব্যবহার ও শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ইত্যাদি সম্পাদনে সহায়তা করে
- শিক্ষা গবেষণা শিখন শেখানো প্রক্রিয়া মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে মানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১.৪ শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষাব্যবস্থা কোনো একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ এর পরিসর ও পরিধি এত ব্যাপক যে কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে কাজ পরিচালনা করা হয়। সুতরাং শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রসমূহকে তার ব্যাপকতার নিরিখে পরিচালনা করতে হয়। নিম্নে কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষার্থীর আচরণের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা যথা: শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
- পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন
- শিখন শেখানো পদ্ধতি
- শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- পরীক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়ন
- শিক্ষকের মান উন্নয়ন
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষাদান পন্থা উদ্ভাবন করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ এর কারণ উদঘাটন ও এর মূল উৎপাটনের উপায় বের করা
- শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের অবক্ষয়
- প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ ও সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- শিক্ষার্থীদের ফলাফল বিপর্যয়
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার প্রয়োগে বাধাসমূহ ও চাকরিতে অসন্তুষ্টি।

নমুনাসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গবেষণা কী?
২. শিক্ষা গবেষণা কী?
৩. গবেষণার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. শিক্ষা গবেষণার ৫টি উদ্দেশ্য লিখুন।
৫. শিক্ষা গবেষণার ৫টি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন।

নমুনারচনামূলক প্রশ্ন

১. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।
২. গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
৩. শিক্ষা গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

তথ্যসূত্র

১. রহমত আলী ছিদ্দিকী, সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২. ড. মো আবু তাহের (২০০৮), সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (১ম সংস্করণ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা
৩. ড. খুরশিদ আলম (২০০৩), সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৫ম সংস্করণ), মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৪. এম. হাসান আলী, মোঃ নাসির উদ্দিন, ড. মোঃ ফিরোজুল ইসলাম (২০১০), সামাজিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি (সমাজবিজ্ঞান), ৩য় প্রকাশ, অনু প্রকাশনী, ঢাকা
৫. জিনাত জামান (১৯৮৭), শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল (১ম প্রকাশ), শিল্পতরু, ঢাকা
৬. ড. ডি এম ফিরোজ শাহ (২০১৭), শিক্ষায় গবেষণা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা।

ইউনিট ২ : গবেষণার শ্রেণিবিভাগ (Types of Research)

একটা কথা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে গবেষণার বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গবেষণাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। অন্যান্য যে কোনো প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা গবেষণাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ মৌলিক (fundamental) গবেষণা এবং ফলিত (applied) গবেষণা। মৌলিক গবেষণা প্রধানত কোনো তত্ত্বীয় ধারণা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব উদ্ভাবন, প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটান সম্ভব। মৌলিক গবেষণা অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কোনো নতুন সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার চেয়ে ফলিত গবেষণাই বেশি প্রচলিত। যেখানে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কোনো সমস্যা দেখা দেয়, যেখানে প্রচলিত ব্যবস্থা ও কৌশলের চেয়ে নতুনভাবে পরীক্ষিত কৌশল বেশি উপযোগী হতে পারে বলে মনে করা হয় সেসকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বা ফলিত শিক্ষা গবেষণা নিয়ে কাজ করা হয়। আবার মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তত্ত্ব বা পরিবর্তিত তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমেও ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উন্নতবিশ্ব মৌলিক এবং ফলিত দুই প্রকারের গবেষণাই পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে মূলত নিজস্ব সমস্যাভিত্তিক ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা হয়। প্রত্যেক উন্নয়নশীল দেশ তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক উন্নয়নকল্পে জরুরি ভিত্তিতে ফলিত শিক্ষা গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।

মৌলিক ও ফলিত গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষা গবেষণাকে আরও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) ঐতিহাসিক গবেষণা
খ) বর্ণণামূলক গবেষণা
গ) পরীক্ষামূলক গবেষণা
ঘ) পরিমাণবাচক, গুণবাচক এবং মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা
ঙ) জরিপ গবেষণা
চ) কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান
ছ) কর্মসহায়ক গবেষণা

গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গভীরতা, বিস্তৃতি, সুযোগ, সময়, বিশ্লেষণের মাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনাপূর্বক গবেষণার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এই ইউনিটে মূলত শ্রেণিবিভাগের মানদণ্ড বাদ দিয়ে বহুল প্রচলিত গবেষণার কিছু ধারা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণা সাম্প্রতিক, অতীতকালের কিংবা দূরবর্তী অতীতকালের কোনো ঘটনার বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন। এটা একপ্রকার গুণগত গবেষণা যেখানে গবেষক অতীতের কোনো ঘটনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপসংহারে উপনীত হন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে অনুমান/ভবিষ্যৎবাণী করেন। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এখানে উপাত্তের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিশ্বস্ততা বা বৈধতা খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। যেমন– তথ্য-উপাত্ত যে সময়ের বলে দাবী করা হচ্ছে আসলেই সেই সময়ের কিনা, যে লেখক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বাসযোগ্য কিনা অথবা ঐ বিষয়ের তথ্য সরবরাহের জন্য উপযুক্ত উৎস কিনা; কিংবা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার দলিল আসলেই সেই সময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল কিনা অথবা ঘটনা ঘটার কত সময় পরে দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে- এমন অনেকগুলো বিষয় গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য উপাত্ত ঐতিহাসিক গবেষণায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়।

ঐতিহাসিক গবেষণা অতীতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং একটা ধারাবাহিক পথরেখা অঙ্কন করতে সাহায্য করে। ফলে আমরা কোন দিক থেকে এসেছি এবং কোন দিকে যাচ্ছি তা বুঝতে সুবিধা হয়। এমনকি অতীতের কোনো ঘটনা বা বিষয় সমাধানের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা জানা যায়।

ঐতিহাসিক গবেষণা একটা ধারাবাহিক এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যেখানে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ:

ক) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ এবং গবেষণা সমস্যার বিবরণ বা গবেষণা প্রশ্ন প্রস্তুতকরণ
খ) সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্মের পর্যালোচনা এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
গ) উপকরণ মূল্যায়ন
ঘ) উপাত্ত সংশ্লেষণ
ঙ) প্রতিবেদন তৈরি করা।

বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা একজন সমাজ গবেষককে ঘটনা বিশ্লেষণের উত্তম প্রেক্ষাপট সরবরাহ করে। ঐতিহাসিক গবেষণার সুবিধার পাশাপাশি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণ: পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের কারণ উদঘাটন এবং তা থেকে শিক্ষণীয়।

সুবিধাসমূহ

- ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা যায়।
- বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়
- চলমান ঘটনা বা সমস্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ সরবরাহ করে।

সীমাবদ্ধতাসমূহ

- ঐতিহাসিক গবেষণা সময় সাপেক্ষ
- সঠিক তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাওয়া কষ্টকর
- তথ্য-উপাত্ত অনেক সময় সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে
- অনেক সময় সমস্যার প্রকৃত কারণ জানা যায় না
- তথ্য-উপাত্ত অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন, অপ্রয়োজনীয় কিংবা ভুল হতে পারে
- বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের মধ্যেই উপাত্তের উৎস সীমিত।

২.২ : বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research)

বর্ণনামূলক গবেষণা বলতে এমন গবেষণাকে বোঝায় যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, পরিস্থিতি বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সঠিক চিত্র প্রদান করে। এটাকে পরিসংখ্যানিক গবেষণাও বলা হয়। বর্ণনামূলক গবেষণায় মূলত নির্ধারিত ঘটনা বা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সাধারণত এটা ‘কী’ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করে, “কেমন করে, কেন, কীভাবে”- এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। এই গবেষণায় ‘কী’ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা হয়। সুতরাং জরিপ এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে এই ধরনের গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কোনো কিছুর অর্থ খুঁজে বের করা, যা কিছু বিদ্যমান তা বর্ণনা করা, কোনো ঘটনা ঘটার হার নির্ণয় করা এবং তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা। বলতে গেলে, বর্ণনামূলক গবেষণা কাজ করে সেসব বিষয় নিয়ে যা গণনাযোগ্য এবং অধ্যয়নযোগ্য। বর্ণনামূলক গবেষণা গুণগত গবেষণাও হতে পারে। আবার পরিমাণগত গবেষণাও হতে পারে। এটা সংখ্যাবাচক তথ্য-উপাত্তকে ছকে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে, আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরির তথ্যসমূহকে বর্ণনা করতে পারে। এই গবেষণায় কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তিতে তা সাজানো, বিশ্লেষণ, লিপিবদ্ধ এবং বর্ণনা করা হয়। তথ্য-উপাত্ত পাঠক যেন সহজে বুঝতে পারে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের চার্ট এবং গ্রাফ সন্নিবেশ করা হয় (গ্লাস এবং হপকিনস, ১৯৮৪)।

উদাহরণ :

একটা এলাকার শিশুদের সচরাচর যে রোগটি ঘন ঘন হয় তা খুঁজে বের করা। এই ধরনের গবেষণার মাধ্যমে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। রোগটি প্রতিরোধ করতে কী কী করণীয়, যার ফলে মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।

সুবিধা :

- এই গবেষণায় তথ্যদাতারা গবেষণার ব্যাপারে অসচেতন থাকে ফলে তারা দৈনন্দিন জীবনের মতো স্বাভাবিক আচরণ করে
- ঐতিহাসিক গবেষণার তুলনায় এই গবেষণা স্বল্পব্যয়ী এবং সময় সাশ্রয়ী
- বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার জন্য খুঁটিনাটি টীকা সংগ্রহ করা হয়
- এ গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু বর্ণনা করা এবং কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া নয়।

অসুবিধা :

- বর্ণনামূলক গবেষণায় গবেষককে অনেক বেশি দক্ষ হতে হয়
- কোনো ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করা হয় না
- এই গবেষণায় তথ্যদাতাদের উত্তর দেওয়ার হার খুবই কম
- এই গবেষণার ফলাফল সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল।

২.৩ : পরীক্ষামূলক গবেষণা (Experimental Research)

পরীক্ষামূলক গবেষণা মূলত কার্যকারণ অনুসন্ধান এবং একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই গবেষণায় কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ‘কারণ’ এবং ‘প্রভাব’ সম্পর্কগুলো পরীক্ষা করে। একটি পরিবর্তনশীল চলক এবং অন্য চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করার জন্য এই ধরনের গবেষণা ব্যবহৃত হয়। এ বহুল প্রচলিত গবেষণা মূলত পরিমাণগত গবেষণার একটি প্রকারভেদ। দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণে বা তুলনা করার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যবহার করে। এই গবেষণায় একটি চলক অন্য চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে কিনা তা দেখা হয়। পরীক্ষামূলক গবেষণায় কতকগুলো অনুমিত সিদ্ধান্ত বা হাইপোথিসিস-এর উত্তর খোঁজা হয়। একটি হাইপোথিসিস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো একটি পরীক্ষণযোগ্য বা যাচাইযোগ্য বিবৃতি যা একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে গবেষককে সাহায্য করে। পরবর্তিতে গবেষক ঐ অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষামূলক গবেষণার নকশা করে যা হাইপোথিসিসকে সমর্থন বা বিরোধিতা করে।

পরীক্ষামূলক গবেষণা ভালোমতো বোঝার জন্য এই গবেষণায় ব্যবহৃত কিছু টার্ম বা পরিভাষা বোঝা খুব জরুরি। মূলত স্বাধীন চলক (independent variable), অধীন চলক (dependent variable), পরীক্ষামূলক দল (experimental group) এবং নিয়ন্ত্রিত দল (control group)- এই চারটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

স্বাধীন চলক (Independent Variable) : এটি গবেষক কর্তৃক নির্ধারিত এবং পরিবর্তনশীল চলক, যা "কারণ" বা ট্রিটমেন্ট চলক হিসেবে পরিচিত। এটা কোনো বৈশিষ্ট্য বা কোনো আচরণও হতে পারে যেটা কোনো কিছুকে প্রভাবিত করে বলে গবেষক মনে করেন। যেমন– কোনো গবেষণায় শিশুদের বয়সের সাথে শারিরীক বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখা হবে। তাহলে শিশুদের বয়স এখানে স্বাধীন চলক ধরে নেওয়া যায়, যার উপর তাদের শারীরিক বৃদ্ধি নির্ভরশীল।

অধীন চলক (Dependent Variable) : এই চলকটি স্বাধীন চলকের প্রভাব বা ফলাফল, যা স্বাধীন চলকের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হলো ফলাফলটি পরিমাপযোগ্য হতে হবে। উপরের গবেষণায় শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি এক্ষেত্রে অধীন চলক।

পরীক্ষামূলক দল (Experimental Group) : গবেষণায় অংশগ্রহণকারী দলটির উপর স্বাধীন চলকের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা হয়। অর্থাৎ যে দলের উপর ট্রিটমেন্ট চলকের প্রভাব দেখা হয় সেটাই পরীক্ষামূলক দল।

নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group) : নিয়ন্ত্রিত দল হলো সেটাই যার উপর কোনো ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করা হয় না কিন্তু তাকেও গবেষণার ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরীক্ষার আওতায় রাখা হয় এবং পরবর্তিতে এই নিয়ন্ত্রিত দল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং পরীক্ষামূলক দলের ফলাফলের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়।

উদাহরণ :

ধরা যাক, একজন গবেষক বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি ক্লাসে "বাংলাদেশ এবং গ্লোবাল স্টাডিস" বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে 'ফ্লিপড ক্লাসরুম' এর প্রভাব যাচাই করতে চান। এক্ষেত্রে হাইপোথিসিস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো 'ফ্লিপড ক্লাসরুম' পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে। এক্ষেত্রে গবেষক শুরুতেই এই কোর্সের শিক্ষার্থীদের সমযোগ্যতাসম্পন্ন দুটি পৃথক দলে ভাগ করে নিবেন। যেখানে প্রথম সেকশনে গতানুগতিক পদ্ধতিতে (যেভাবে এতদিন পড়ানো হতো) পাঠদান করা হবে, অন্যদিকে অন্য সেকশনে 'ফ্লিপড ক্লাসরুম' পাঠদান কৌশল ব্যবহার করে একই বিষয় পাঠদান করা হবে। উভয় সেকশনেই পাঠের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু একই হবে। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই প্রশ্নপত্রে দুই সেকশনে পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য এই দুই দলের ফলাফল তুলনা করা হবে। এখানে 'ফ্লিপড ক্লাসরুম' কৌশল স্বাধীন চলক এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল অধীন চলক। আর যে সেকশনে ফ্লিপড ক্লাসরুম কৌশল ব্যবহার করে পাঠদান করা হয়েছে সেটা পরীক্ষামূলক দল, আর যে সেকশনে গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রিত দল। এটি পরীক্ষামূলক গবেষণা নকশা ব্যবহারের একটি চমৎকার উদাহরণ।

সুবিধা

- বিভিন্ন চলকের মধ্যে কারণ এবং ফলাফলের সম্পর্ক নির্ধারণে পরীক্ষামূলক গবেষণা খুবই কার্যকরী
- এই গবেষণায় চলকের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং অন্যান্য চলকের প্রভাব বাদ দেওয়া বা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়
- পরীক্ষামূলক গবেষণায় গবেষণার পরিবেশ, পর্যবেক্ষণ দল এবং অন্যান্য চলকের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে ফলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়
- এই গবেষণায় একই শর্ত মেনে একইভাবে গবেষণার পুনরাবৃত্তি করে ফলাফল পরীক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ থাকে, ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি হয়।

অসুবিধা

- সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা করা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবতার বিবেচনায় কিংবা নৈতিক বিবেচনায় গবেষণা করা যায়
- পরীক্ষামূলক গবেষণার বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ হলো এটা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে গবেষণা চালিয়ে থাকে, যা অনেক সময় বাস্তবতা বিবর্জিত
- মানুষ মাত্রই ভুল করে- তাই এই ধরনের গবেষণায়ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- স্বাধীন চলকের উপর গবেষকের নিজস্ব প্রভাব পড়ে ফলে স্বাধীন চলক স্বাধীনতা হারায়, এতে গবেষণার ফলাফল পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে
- পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলাফল সমগ্র জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে না, ফলে সাধারণীকরণ করা যায়না
- পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্র অনেক বড় হলে (যেমন– হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি) বহিরাগত চলক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, ফলে সঠিক কার্যকারণ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২.৪ : পরিমাণবাচক, গুণবাচক এবং মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা (Quantitative, Qualitative and Mixed Methods in Education Research)

সাধারণত শিক্ষা ক্ষেত্রে তিন ধরনের গবেষণা প্রচলিত যথা : পরিমাণবাচক, গুণবাচক এবং মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা।

২.৪.১ : পরিমাণবাচক গবেষণা (Quantitative Research)

পরিমাণবাচক গবেষণায় সংখ্যাগত বা পরিমাণবাচক উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণায় সংখ্যাগত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয়। পরিমাণবাচক উপাত্ত হলো বিভিন্ন সংখ্যা এবং পরিসংখ্যান। এখানে সুবিধা হলো যে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা যায়। উত্তম গবেষণা নকশার মাধ্যমে গবেষণা করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা সমগ্র তথ্যবিশ্বের জন্য সাধারণীকরণ করা যায়। এই গবেষণায় অবশ্য একটা ত্রুটি আছে সেটা হলো গবেষণার গভীরতা। এখানে গভীরতার অভাব হতে পারে (যেমন– এই গবেষণায় ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধান, প্রেক্ষাপট, আবেগ বা অনুভূতি বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না)। এই গবেষণায় সঠিকভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য গবেষককে গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হতে হবে।

পরিমাণবাচক গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করতে এবং আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করার লক্ষ্যে সংখ্যাবাচক উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় এবং চিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হয়। গবেষক সংখ্যার ব্যবহার করে উন্নত এবং শক্তিশালী পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন, যাতে ফলাফলের একটি পরিসংখ্যানগত ভিত্তি থাকে। এটি শুধু যেন একটি অনুমানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ না হয়। পরিমাণবাচক গবেষণায় সবার আগে গবেষক কী পরিমাপ করছেন তা উল্লেখ করতে হয়। গবেষক যা খুঁজছেন তা উল্লেখ করলে তাঁর মনোযোগ কেবল একটি নির্দিষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক জিনিসে নিমগ্ন থাকে।

পরিমাণবাচক গবেষণার সুবিধা (Advantages of Quantitative Research)

- সংখ্যাবাচক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় বলে সহজেই অধিকসংখ্যক নমুনার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়
- উপাত্ত বিশ্লেষণের সময় পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি অনুসরণ করায় ফলাফলের নৈর্ব্যক্তিকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং গবেষণার ফলাফলের উপর গবেষকের কোনো ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে না
- সংখ্যাগত ফলাফল গ্রাফ, চার্ট, টেবিল এবং অন্যান্য ফরমেটে সুন্দরভাবে এবং সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা যায়
- উপাত্ত বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান সফটওয়্যার ব্যবহার করেই করা যায়
- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়ন করা হয় এবং নমুনার আকারও প্রতিনিধিত্বমূলক হয় ফলে গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ বা সার্বজনীন করা যায়
- উপাত্ত সংগ্রহের কাজ তুলনামূলক দ্রুত করা যায়, যদিও এটা উপাত্তের ধরনের উপর নির্ভর করে
- তাছাড়া পরিমাণবাচক তথ্য নীতিনির্ধারক, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং প্রশাসকদের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়।

অসুবিধা (Disadvatages of Quantitative Research)

- পরিমাণবাচক গবেষণার মূল অসুবিধা হলো এই গবেষণায় প্রেক্ষাপট উপেক্ষিত হয়
- সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক নমুনার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিমাণবাচক গবেষণা 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

২.৪.২ : গুণবাচক গবেষণা (Qualitative Research)

গুণবাচক গবেষণা কোনো বিষয়ের ধরন এবং মান নিয়ে আলোচনা করে, অন্যদিকে কোনো ঘটনাকে এমনভাবে তুলে ধরে যেন সহজে বোধগম্য হয়। বর্ণনামূলক বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে গুণবাচক গবেষণায় গবেষক বিষয়টাকে এমনভাবে চিত্রায়ন করার চেষ্টা করেন যেন তিনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা সবাই দেখতে পান। গুণবাচক গবেষণার রীতি অনুসারে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করার সুযোগ কম। এ গবেষণায় অধ্যয়নের জন্য খুব অল্প নমুনা নেওয়া নয়, ক্ষেত্র বিশেষে একজনও নমুনা হতে পারে। ফলে গবেষণার ফলাফল সার্বজনীন হয় না। গুণবাচক গবেষণা গবেষকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং কোনো অবস্থার বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। এর ফলে গবেষকের পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি একেবারে অগ্রাহ্য করা যায়না। গুণবাচক উপাত্ত বলতে শব্দ, মতামত, চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণকে বুঝায়। সুবিধা হলো এই যে যে কোনো ঘটনা, মানুষ কিংবা দল সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়।

গুণবাচক গবেষণা অপরিমাণবাচক বিশ্লেষণকে উপস্থাপন করে। গুণবাচক গবেষণা হলো মানুষ যা করে এবং বলে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া। গুণবাচক গবেষণা হলো কোনো বিষয় বা ঘটনার অর্থ, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রতীকএবং বর্ণনা। এই ধরনের গবেষণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (প্রধানত সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং ফোকাস দলীয় আলোচনা)। এই গবেষণার প্রকৃতি অনেকটা অনুসন্ধানমূলক এবং উন্মুক্ত। অল্প কিছু সংখ্যক নমুনার কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সরাসরি পর্যবেক্ষণ কিংবা ফোকাস দলীয় আলোচনার মাধ্যমে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনার গভীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।

গুণবাচক গবেষণা এমনসব বিষয় এবং ঘটনা নিয়ে গবেষণা করে যেগুলো গাণিতিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ, যেমন– মানুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিপ্রায়, লক্ষণ এবং প্রতীক। গুণবাচক গবেষণা মূলত মানুষের আচরণকে খুব গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং তার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করে। মূলত কোনো ঘটনা কোথায় ঘটলো সেটাই শুধু নয় বরং কেন ঘটলো, কিভাবে ঘটলো সেটাও এই গবেষণা খুঁজে বের করে।

সুবিধা

- এই গবেষণা মানুষের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বা বিধিনিষেধ খুব কম
- সব কিছু সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায়না। গুণবাচক গবেষণার মাধ্যমে কিছু বিষয়কে আরো গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ থাকে
- অনুসন্ধানী গবেষণা এবং অনুমিত সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য এই গবেষণা সাহায্য করে
- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতা নিজের মতো করে তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

অসুবিধা

- গুণবাচক গবেষণার বৈধতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করা তুলনামূলক কঠিন কাজ
- উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রভাব অনেক বেশি
- অনেক সময় উপাত্ত অনেক বেশি হয়ে যায় ফলে উপাত্ত বিশ্লেষণে অনেক সময় লেগে যায়
- গুণবাচক গবেষণায় সময় বেশি লাগে।

গুণবাচক গবেষণা বনাম পরিমাণবাচক গবেষণা :

গুণবাচক গবেষণা হচ্ছে যেখানে কোনো কিছুর গুণকে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে পরিমাণবাচক গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে সংখ্যাবাচক পর্যালোচনা। অর্থাৎ সংখ্যাবাচক পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে ব্যাখ্যা করা। যা কিনা গুণবাচক গবেষণায় গুণকে পর্যালোচনা করে।অনেকে গুণবাচক গবেষণা এবং পরিমাণবাচক গবেষণা নিয়ে বিতর্ক করে থাকেন, কোনোটা বেশি কার্যকরী এটা নিয়ে হরহামেশা তর্ক করেন। কিন্তু কোনোটা কার্যকরী কিংবা সুবিধাজনক সেটা নির্ভর করবে আপনার গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য, নমুনা ইত্যাদি বিষয়য়ের উপর। যেমন– কোনো একজনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, “বলুন দেখি হাতুড়ি বেশি ভালো হবে নাকি কোদাল বেশি ভালো হবে?”। কী জবাব দেবেন তিনি? তিনি সবার আগে যেটা জানতে চাইবেন সেটা হলো “আপনি কী কাজ করবেন?”। অর্থাৎ আপনার কাজের উপর নির্ভর করবে কোনো যন্ত্রটি আপনার জন্য ব্যবহার করা ভালো হবে। একইভাবে আপনার গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে গুণবাচক পদ্ধতি নাকি পরিমাণবাচক পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো হবে।তবে গুণবাচক গবেষণা গবেষকের দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। পরিমাণবাচক গবেষণা ডকুমেন্ট বা রেকর্ড এর উপর নির্ভরশীল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক।

২.৪.৩ : মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা (Mixed Method Research)

মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা হলো এক ধরনের গবেষণা যেখানে গুণবাচক এবং পরিমাণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল কিংবা অন্য কোনো ধরনের পদ্ধতি-কৌশল একসাথে ব্যবহার করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে যে গবেষণায় একইসাথে গুণবাচক এবং পরিমাণবাচক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা বলা হয়। এই গবেষণায় গুণবাচক গবেষণা এবং পরিমাণবাচক গবেষণা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন– কোনো গবেষণার এক ধাপে পরিমাণবাচক গবেষণা এবং অন্য ধাপে গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আবার কোনো গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একই প্রশ্নপত্রে কিছু বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং কিছু মুক্ত প্রশ্ন সরবরাহ করা যায়, যা পরবর্তিতে কোনো বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার পাশাপাশি সেই ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে। আবার অনেক সময় গবেষক গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তিতে সেগুলোকে পরিমাণবাচক তথ্যে রূপান্তর করতে পারে।

মূলত এই গবেষণায় উভয় ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণার উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়। সেইসাথে বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার ফলে তথ্যসমূহ ক্রস চেক করা সম্ভব হয় যা গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। তবে মনে রাখা ভালো যে, সব গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করার দরকার নেই কিংবা এই পদ্ধতি ব্যবহার করলেই যে গবেষণাটি ভালো হবে এমন মনে করার কারণ নেই। বরং যেখানে প্রয়োজন সেখানে মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। মিশ্র পদ্ধতির গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার কাজের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান করা জরুরি যেন একটা প্রেক্ষাপট উঠে আসে। তবে গবেষককে খেয়াল রাখতে হবে যেন এক ধরনের উপাত্ত আরেক ধরনের উপাত্তের (গুণবাচক এবং পরিমাণবাচক উপাত্ত) সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে, কোনোভাবে যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

২.৫ : জরিপ গবেষণা (Survey Research)

জরিপ গবেষণার নমুনা আজকাল দৈনিক পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পাই। কোনো দেশের সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা কিংবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নতুন কোনো পণ্যের ব্যবসায়িক সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে জনমত জরিপ করে থাকে। সাধারণভাবে জরিপ কথাটি শুনলেই জনসংখ্যা জরিপ (আদমশুমারি) এবং ভূমি জরিপের কথা মনে আসে।

সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত গবেষণার মধ্যে জরিপ গবেষণা অন্যতম। আজকাল দ্রুত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপকৃত জনসংখ্যা ও তার হার নির্ধারণের প্রয়োজনে, কোনো সামাজিক সমস্যার ব্যাপকতা ও ধরন নির্ধারণে, কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতা বা ব্যবহারের ব্যাপকতা নির্ধারণে, মতামত যাচাইয়ের জন্য সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণে কোনো নীতিমালার সাফল্য এবং ব্যর্থতা যাচাইয়ে জরিপ গবেষণা করা হয়। বস্তুত শুধু উপর্যুক্ত ক্ষেত্রেই নয়, আরও অসংখ্য নতুন নতুন ক্ষেত্রে জরিপ গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

জরিপ গবেষণা পরিচালনা করতে কখনও একটি গ্রাম, একগুচ্ছ গ্রাম কিংবা কয়েকটি উপজেলা থেকে নমুনা নেওয়া হয় অথবা কখনও জাতীয় নমুনা জরিপ (national sample survey) পরিচালনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিপ চালানো যেতে পারে। এতে প্রতি পাঁচ বছরে কী হারে লোকেরা ভূমিহীন হচ্ছে, জমি কি ধনীদের হাত থেকে দরিদ্রদের হাতে যাচ্ছে না তার উল্টো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বর্গাদারীর ক্ষেত্রে কি ঘটছে, জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসছে ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জানা যায়।

জরিপ গবেষণায় গবেষক প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং বৃহৎ পরিমাণ জনগণকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে বর্ণনা করার জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকে। এখানে সতর্কভাবে সম্ভাবনা নমুনার মাধ্যমে কাজ করা হয়। এই সম্ভাবনা নতুন একক বৃহৎ পরিমাণ জনগণকে প্রকাশ করে বা প্রতিনিধিত্ব করে এবং এখানে মানসম্মত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সতর্কভাবে একই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সকল উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপ পদ্ধতি সাধারণত বর্তমান বিদ্যমান সমাজের কোনো সমস্যা নিয়ে করা হয়। কোনো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করার জন্য জরিপ পদ্ধতি নির্বাচন করা সঠিক।জরিপ গবেষণায় কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। সর্বপ্রথমে জরিপ কাজটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। এরপর লক্ষ্যদল নির্ধারণ করতে হয়। লক্ষ্যদলের পরের ধাপে কোনো প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করা আবশ্যক তা নির্ধারণ করতে হয়। অতঃপর প্রশ্নমালার মাধ্যমে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করতে চাইলে অত্যন্তগুরুত্ব সহকারে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করতে হয়। তারপর যারা প্রশ্নামালাটি মাঠপর্যায়ে ব্যবহার করবেন সেইসব মাঠ কর্মীদের নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হয়। জরিপ গবেষণায় প্রশ্নমালা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং প্রশ্নমালা তৈরি করার সময় নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি:

- উত্তরদাতার কাছে যে সমস্তশব্দ অপরিচিত মনে হতে পারে সেগুলো ব্যবহার না করা
- নেতিবাচক শব্দ বা ধারণা উপস্থাপন না করা
- একই প্রশ্নে অত্যধিক তথ্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার না করা
- মানবাচক শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে চলা
- ‘একইরকম’ কিংবা ‘আগের মতো’ জাতীয় উত্তর আসতে পারে এমন প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত না করা
- পরামর্শ বা উপদেশমূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত না করা
- উত্তরদাতাকে মাথা খাটাতে হবে কিংবা মুখস্থ উত্তর দিতে হবে এমন কোনো প্রশ্ন না করা
- প্রশ্ন সবসময় ছোট, সহজবোধ্য এবং মূর্ত হওয়া উচিৎ

উদাহরণ:
বাংলাদেশের ঢাকা শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর একটা জরিপ করা হয়। দেখা যায় গড়ে প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এর মধ্যে ৭০% সময় তারা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যয় করেন, ১০% সময় তারা গুগল ব্রাউজ করে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেন, ১০% সময় তারা ইউটিউব এ ব্যয় করেন, ৮% সময় শিক্ষক বাতায়নসহ অন্যান্য শিক্ষণীয় কাজে ব্যয় করেন এবং ২% সময় বিবিধ কাজ করেন।

২.৬ : কেস স্টাডি (Case Study)

কেস স্টাডি গবেষণা বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি হলো গুণবাচক গবেষণার আরেকটি ধারা। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো ঘটনার অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ এককের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বাস্তবধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তিতে একই ধরনের ইউনিট বা একক সম্বন্ধে সাধারণীকরণে পৌঁছানো সম্ভব। ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির মূল কৌশল হলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা।
উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ আবার দুই রকমের হতে পারে– অংশগ্রহণমূলক এবং অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে পর্যবেক্ষণ। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক নিজেই লক্ষ্যণীয় ইউনিট বা দলের সাথে মিশে যান কিন্তু অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৌশলের ক্ষেত্রে গবেষক দলগত কার্যপ্রণালী থেকে দূরে অবস্থান করে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।
কেস স্টাডি গবেষণায় গবেষককে যে সমস্তদিকে খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হচ্ছে :

- সতর্কতার সাথে বাস্তবতার নিরিখে প্রাথমিক ধারণা থেকে কার্যকর গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা
- গবেষক হিসেবে সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসেব পর্যবেক্ষণ করা
- কোনো ধরনের বর্জনযোগ্য চিন্তাভাবনা ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা
- গবেষণা কাজটির জন্য উপযুক্ত স্থান বা ক্ষেত্র খুঁজে বের করা
- যোগ্যতর তথ্য প্রদানকারীকে খুঁজে বের করা
- পর্যবেক্ষণের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা
- তথ্য, প্রমাণ ও দলিলাদি কিভাবে রেকর্ড করা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা
- তথ্য শ্রেণিবদ্ধকরণসম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
- ধারণা হতে কার্যসম্পাদন পর্যন্ত মধ্যবর্তী পর্যায়ে কতটুকু সময় লাগবে তা নির্ধারণ করা
- গবেষণা প্রতিবেদন কোনো পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের দর্শকের সামনে প্রকাশ করা হবে তা নির্ধারণ করা।

কেস স্টাডি গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলের স্বীকৃতি পেতে হলে গবেষককে কতকগুলো বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন–

- তথ্য সংগ্রহ কৌশল, নমুনায়ন পদ্ধতি এবং তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে হবে
- সংগৃহীত তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রদর্শন করতে হবে এবং যে কোনো সময় পূনঃবিশ্লেষণের নিমিত্তে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে
- প্রতিবেদনে ঋণাত্মক উদাহরণসমূহের উল্লেখ থাকবে
- মাঠ পর্যায়ের কাজের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে
- অনুমান এবং প্রমাণমূলক কাজের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে
- প্রাইমারি এবং সেকেণ্ডারি তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে, সেই সাথে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যেও পার্থক্য তুলে ধরতে হবে
- প্রকৃত কাজের বিবরণ ডায়েরির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে
- তথ্যের উৎকর্ষতা যেন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২.৭ : কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research)

আধুনিক শিক্ষা গবেষণায় ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে কর্মসহায়ক গবেষণা (action research)। শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রমে কর্মসহায়ক গবেষণা একটি নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ধারা সংযোজন করেছে। প্রথম থেকেই এই গবেষণা পদ্ধতি বাস্তব জগতের প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছে এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অতিদ্রুত তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে।কর্মসহায়ক গবেষণার দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা। আর তাই সমাজের পরিবর্তনের জন্য নতুন পথের সন্ধান কর্মসহায়ক গবেষণা দিয়ে থাকে। ১৯৪৪ সালে কার্ট লিউইন কর্মসহায়ক গবেষণাকে ব্যবহার করেন তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে। তিনি কার্য ও গবেষণাকে একত্রিত করেন যা সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে উদ্ভূত কোনো একটি সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য একটি আধুনিক প্রক্রিয়া। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভরশীল অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা ধারণার মধ্যে কোনো একটি সমস্যা সনাক্ত করে একই পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করা হয়। এ ধরনের গবেষণা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। একদল গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ একসাথে কাজ করে নিজেরাই গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করার মাধ্যমে সমস্যার একটি প্রায়োগিক সমাধান বের করেন।

কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা (Concepts of Action Research)

কর্মসহায়ক গবেষণা হলো এক ধরনের প্রায়োগিক গবেষণা। কোনো ব্যক্তি তার পেশাগত কাজে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য যে গবেষণা পরিচালনা করেন তাই কর্মসহায়ক গবেষণা। এই গবেষণায় গবেষক নিজেই এই সমস্যার সম্মুখীন। পেশাগত অনুশীলন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও এ গবেষণা পরিচালনা করা যায়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোনো চলমান কাজের উপর ক্ষুদ্রমাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তিতে এই পরিবর্তিত কাজের উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হয় তখন আমরা বলতে পারি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি নিজ পেশার উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা করছেন। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা দেখা দেয় তখন সেই সমস্যার গুরুত্ব ও গভীরতা চিহ্নিত করে সকলের সহযোগিতায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এর সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞা : বিভিন্ন গবেষক কর্মসহায়ক গবেষণাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যেমন–

- “কর্মসহায়ক গবেষণা হলো সামাজিক কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যা কোনো সমস্যা সমাধান এবং সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য কিছু সংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ করতে পারে। গবেষক নিজেই গবেষণার ক্ষমতা অর্পণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে কাজ করতে পারে।”-পালমার ও জনসন।
- “কর্মসহায়ক গবেষণার মৌলিক অনুমান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত রীতি বা অভ্যাস পরিবর্তনের ফলাফল অন্যের দ্বারা নিরীক্ষার চেয়ে নিজে নিরীক্ষা করা।”-কুক।
- Action Research is a three steps spiral process of (1) planning which involves reconnaissance; (2) talking actions and; (3) fact-finding about the results of the action.-Kurt Lewin.
- Action Research is the process by which practitioner’s attempts to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions.-Stephen Corey.
- Action Research in education is study connected by colleagues in a school setting of the result of their activities to improve instructions.- Carl Ghekman.
- Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place. -Emily Calhoun.

কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্ভাবক ও অন্যান্য যারা বিভিন্ন গবেষণার সাথে জড়িত তারা নিজেদের কর্মের সুবিধার্থেই এ ধরনের গবেষণা কর্মে যুক্ত হন যেন তাঁদের গবেষণা কর্ম অধিক কার্যকারিতালাভ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যারা শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, তাঁদের পরিচালিত গবেষণার ফলাফল শিক্ষাক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকরী নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের উৎসাহিত হওয়া আবশ্যক তাদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। শিক্ষামূলক কর্মসহায়ক গবেষণা হলো এক ধরনের শিক্ষা প্রযুক্তি যা দ্বারা একজন শিক্ষক কার্যকরীভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনকে উন্নত করতে পারেন। কর্মসহায়ক গবেষণা হতে প্রাপ্ত উপাত্ত কাজে লাগিয়ে একজন শিক্ষক বুঝতে পারেন কী কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা বিরাজমান এবং সমস্যার প্রভাব কিভাবে দূর করা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শিখন অভিজ্ঞতার উন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা হলো শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ায় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্বকে তাৎক্ষণিক প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধান বা সমাজের চলতি রীতির পরিবর্তন করা হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে।কর্মসহায়ক গবেষণার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকর্মসহায়ক গবেষণা বাস্তব সমস্যাভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি যা বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে। এটি সামাজিক গবেষণা থেকে একটি ভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি।

কার্ট লিউইন(১৯৪৭)-এর মতানুসারে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীনের অধীনে কোনো পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিবেচনা করে কিছু কার্যক্রম এবং গবেষণা পরিচালনা করা।

নিম্নে কর্মসহায়ক গবেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

- **কার্যভিত্তিক (Action Oriented) :** কর্মসহায়ক গবেষণা শুধু সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে না, বরং সমস্যা সমাধানের জন্য তা কার্যে পরিণত করে।
- **আবর্তনশীল (Cyclical Process) :** কর্মসহায়ক গবেষণা গবেষণার একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সমস্যা চিহ্নিত করে, সমাধানের তত্ত্ব আবিষ্কার করে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

- **সমন্বিত প্রক্রিয়া (Integration Process) :** কর্মসহায়ক গবেষণা কোনো স্তর বাধাপ বুঝায় না, বরং গবেষণার সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- **বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (Scientific Process) :** কর্মসহায়ক গবেষণা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান করা হয়ে থাকে।
- **ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Systematic Process) :** কর্মসহায়ক গবেষণা সমস্যা সমাধানের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি সমস্যা চিহ্নিতকরণ হতে শুরু হয়ে তত্ত্ব প্রণয়ন এবং তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করে ফলাফল মূল্যায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত (Future Oriented) :** কর্মসহায়ক গবেষণা শুধু অতীত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না বরং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ভবিষ্যতে প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করে থাকে।
- **বাস্তব সমস্যাভিত্তিক (Practical Problem Oriented) :** কর্মসহায়ক গবেষণা সব সময় সমাজ জীবনের বা প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে
- **যৌথ প্রচেষ্টা (Collaboration) :** কর্মসহায়ক গবেষণা গবেষক এবং সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে।
- **অবস্থানভিত্তিক (Situational) :** কর্মসহায়ক গবেষণা সমস্যার বিভিন্ন অবস্থানে ভিন্নতর হতে পারে। সব সমস্যার জন্য একই রকম প্রক্রিয়া ব্যবহার নাও হতে পারে।

তাছাড়া কর্মসহায়ক গবেষণার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

- কর্মসহায়ক গবেষণা এক ধরনের আত্মপ্রতিফলনমূলক অনুসন্ধান।
- এটি ব্যবহারকারী বা অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের দ্বারা গৃহীত হয়।
- এ গবেষণা সাধারণত স্বীয় পেশাগত, শিক্ষাগত, সামাজিক কার্য বা চর্চার উন্নয়ন অথবা স্বীয় দুর্বলতা আবিষ্কার ও উন্নয়নে পরিচালিত হয়।
- এটি এক ধরনের সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা তাই নতুন গবেষকবৃন্দ স্বীয় সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের কাছ কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করতে পারেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য কোনো স্বত:সিদ্ধ একক সাধারণ পদ্ধতি নেই। তাই এখানে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং তথ্য সংগ্রহের অংশ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।পদ্ধতিগতভাবে কর্মসহায়ক গবেষণায় একই সাথে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় ও অনুসরণ করা সম্ভব। গবেষক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।
- এটি যুক্তি নির্ভর এবং গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনে পরিচালিত হয়।
- এটি গবেষকদের প্রতিদিন যে সমস্ত পেশাগত কার্যক্রম সমাধা করেন, তার নিয়মতান্ত্রিক কার্যকারিতা যাচাই বা পরীক্ষা নিরীক্ষাকরণে সহায়তা করে।
- শিক্ষায় কর্মসহায়ক গবেষণার মূল আলোকপাত করা হয় শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের উপর। এর মূল লক্ষ হচ্ছে সম্পৃক্তকরণ এবং শিক্ষাগত ভিত্তি হচ্ছে গুণগত মানোন্নয়ন।
- কর্মসহায়ক গবেষণা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসকের নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং শিখন ও নীতি নির্ধারণকে দৃঢ় করে।
- কর্মসহায়ক গবেষণা মূলত ২টি ‘W’ এবং ১টি ‘H’ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পরিচালিত হয়। যথা- কি (What), কেন (Why), কিভাবে (How)।
- যেহেতু এই গবেষণা নির্দিষ্ট স্থানে বসে পরিচালনা করা হয় তাই দলভিত্তিক মিথস্ক্রিয়া পাওয়া যায়।
- এই পদ্ধতির নমনীয়তা ও সহযোজন ক্ষমতা রয়েছে।
- অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির মূল পার্থক্য হলো কোনো একটি বিশেষ চলককে কখনোই সমষ্টি থেকে পৃথক করে পর্যবেক্ষণ করা হয়না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কর্মসহায়ক গবেষণা সর্বদাই ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট। তাই মূলত আমাদের বুঝতে হবে, কিভাবে এ পরিবর্তন আনা যায়, কেন এই পরিবর্তন প্রয়োজন? কি পরিবর্তন আমরা চাই? তাহলে কর্মসহায়ক গবেষণার মূল লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

২.৮ : মৌলিক ও সামাজিক গবেষণার মধ্যে পার্থক্য

(Difference between Fundamental and Social Research)

২.৮.১ : মৌলিক গবেষণা

যে গবেষণার দ্বারা কোনো মৌলিক তত্ত্বের ও পূর্বানুমানের উন্নয়ন ও পরীক্ষা করা হয় তাই মৌলিক গবেষণা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি এবং গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির উন্নয়ন। মৌলিক গবেষণাপ্রাপ্ত এসব জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভবিষ্যতে সামাজিক প্রায়োগিক দিক থাকবে, কিন্তু বর্তমানের সমস্যা সমাধানের কোনো প্রায়োগিক দিক নেই (ড. খুরশিদ আলম ২০০৩:৯৭)। এক কথায় বললে যে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা হয় এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয় তাই মৌলিক গবেষণা (Kothari ২০০৪:৩)। বস্তুত মৌলিক গবেষণা দুটি কাজ সম্পন্ন করে।

- নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং
- বিদ্যমান তত্ত্বের উন্নয়ন

মৌলিক গবেষণার আসল উদ্দেশ্য হলো নতুন তত্ত্ব তৈরি করা কিংবা বিদ্যমান কোনো তত্ত্বের উন্নয়ন করা। যেমন: পিয়াঁজে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিয়ে একটা গবেষণা করেছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুরা কীভাবে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে শিখে থাকে তাই নিয়ে একটা তত্ত্ব দেওয়ার জন্য তিনি গবেষণা কাজটি পরিচালনা করেন। শিশুদের শিখনের আনুষ্ঠানিক অপারেশনাল স্তরে এসে তা তাঁদের আচরণে পরিণত হয়। শিশুরা কী শিখবে বা শিক্ষা কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে শিখে।

মৌলিক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে একদিকে খরচ বেশি, অন্যদিকে অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিও আছে। অনেকসময় গবেষণার মেয়াদ বাড়তেই থাকে, ফলে কতদিন ধরে অর্থব্যয় করতে হবে তা অনিশ্চিত। অন্যদিকে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগে এবং আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এই গবেষণার কোনো প্রয়োগ না হলেও পরবর্তিতে নানাভাবে এই গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ করা হয়। এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে অনেক বাণিজ্যিক পণ্য প্রস্তুত করা হয় ।

২.৮.২ : সামাজিক গবেষণা কী?

সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে বোঝানো হয়। সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের বিষয়বস্তু মানুষ, মানুষের মন, মানুষের সমাজ, মানুষের সংস্কৃতি, মানুষের অর্থনীতি, মানুষের রাজনীতি প্রভৃতি। মোট কথা মানুষ, তার আচরণ ও ক্রিয়া এবং মানুষের সমাজ-সংগঠন সামাজিক বিজ্ঞানীদের সাধারণ বিষয়বস্তু। একারণে সামাজিক গবেষণা বলতে শুধু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া, সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতত্ত্বে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় সামাজিক গবেষণা বিষয়ক আলোচনায় সাধারণত ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এখানে সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাকেই বোঝানো হবে। বলা বাহুল্য, সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই বুঝায়।

সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য :

সামাজিকগবেষণার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিচে সামাজিক গবষণার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো:

- সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক
- সামাজিক গবেষণা দুই বা ততোধিক চলকের (variable) মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করে
- সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে
- সামাজিক গবেষণা বাস্তব তথ্য নির্ভর
- সামাজিক গবেষণা ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল
- সামাজিক গবেষণা তত্ত্ব গঠনে সহায়ক
- সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করে।

সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ :

কোনো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা বা কোনো অজানা বিষয়ে জানার চেষ্টা করা। বস্তুত গবেষণাকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

- মৌলিক গবেষণা (Basic or fundamental research)
- ফলিত গবেষণা (Applied research)
- কার্যোপযোগী গবেষণা (Operational research)
- মূল্যায়ন গবেষণা (Evaluative research)
- জরিপ গবেষণা (Survey research)
- মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Field investigative research)

২.৮.৩ : মৌলিক ও সামাজিক গবেষণার মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Fundamental and Social Research)

মৌলিক গবেষণা	সামাজিক গবেষণা
নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি এবং বিদ্যমান তত্ত্বের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়	বাস্তবসম্মত উপায়ে যে কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়
জ্ঞান সৃষ্টির উপর মূল মনোযোগ থাকে	জ্ঞান প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের দিকে মনোযোগ থাকে
জ্ঞানের একটি শাখার বিভিন্ন মৌলিক নীতিসমূহ প্রয়োগ করে তত্ত্বটি বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করে	জ্ঞানের একটি প্রায়োগিক শাখাকে বিবেচনা করে সমস্যার সমাধান করে
জ্ঞানের একটি মাত্র শাখা থেকে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করে	অনেক সময় একটি সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমন্বিত হয়ে কাজ করে
গবেষণার ফলাফল সার্বজনীন করার পক্ষপাতী	কখনও কখনও ফলাফল সার্বজনীন করার উদ্দেশ্য ছাড়াও একক কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করে
পূর্বাভাস পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়	কোনো বিষয় বা ঘটনা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে তা ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়
অন্যান্য চলকসমূহের পরিবর্তন হবে না ধরে নিয়েই গবেষণা করা হয়	স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য চলকগুলো পরিবর্তনশীল ধরে নেওয়া হয়
জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটা শাখার প্রযুক্তিগত ভাষা অনুসরণ করে প্রতিবেদন সংকলন করা হয়।	সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে গবেষণা প্রতিবেদন সংকলন করা হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঐতিহাসিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়?
২. বর্নণামূলক গবেষণার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. পরীক্ষামূলক গবেষণা কী?
৪. মিশ্র পদ্ধতির গবেষণার ৩টি গুরুত্ব লিখুন।
৫. কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান গবেষণার স্বীকৃতি পেতে গবেষকের কী কী করণীয় লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিমাণবাচক গবেষণা এবং গুণবাচক গবেষণা বলতে কী বোঝায়?এদের ৫টি মৌলিক পার্থক্য লিখুন।
২. ঐতিহাসিক গবেষণা কী? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।
৩. কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা করা হয়? একটি উদাহরণসহ বর্ণনামূলক গবেষণার বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. পরীক্ষামূলক গবেষণায় স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক বলতে কী বুঝায়? উদাহরণস্বরূপ একটি পরীক্ষামূলক গবেষণার স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক ব্যাখ্যা করুন।
৫. জরিপ গবেষণা বলতে কী বোঝায়? এ গবেষণায় প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে গবেষককে কোনো কোনো বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়?
৬. কর্মসহায়ক গবেষণা কী? দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে এই ধরনের গবেষণার কার্যকারিতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন ।পেশাগত মান উন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে লিখুন।
৭. মৌলিক গবেষণা এবং সামাজিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়? এদের মধ্যে ৫টি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

তথ্যসূত্রঃ

- Bernard, H. R., and Bernard, H. R. (2012). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Gall, M. D., Borg, W. R., and Gall, J. P. (1996). *Educational research: An introduction* . Longman Publishing.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. H. (1993). *How to design and evaluate research in education* (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.
- Keppel, G. (1991). *Design and analysis: A researcher's handbook* . Prentice-Hall, Inc.
- Lipsey, M. W. (1990). *Design sensitivity: Statistical power for experimental research* (Vol. 19).
- Neuman, W. L., and Neuman, W. L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches*. Sage.
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative*. Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications, Incorporated.
- Neuman, W. L., and Robson, K. (2004). *Basics of social research*. Pearson.
- Neuman, W. L., and Neuman, W. L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.
- Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. *The lancet, 358*(9280), 483-488.
- Robson, C. (2002). *Real world research* (Vol. 2). Oxford: Blackwell publishers.
- https://www.slideshare.net/vaisalik/types-of-research

ইউনিট ৩ : সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

যে কোনো গবেষণাকে গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন করতে সাহিত্য পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণার বিষয় ও সমস্যা নির্বাচনে সাহিত্য পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে গবেষণা ক্ষেত্রের মৌলিক ভিত্তি দৃঢ় করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন মাধ্যমে ধারণকৃত ও সংরক্ষিত তথ্য বা ডকুমেন্ট গবেষণা সাহিত্য বা লিটারেচার নামে পরিচিত। এগুলো থেকে একজন গবেষক তার গবেষণা বা অনুসন্ধান ক্ষেত্রের সার্বিক ধারণা পেয়ে থাকেন। গবেষণা শুরুর পূর্বে একজন গবেষক যদি তার অনুসন্ধান/ গবেষণা ক্ষেত্রের আওতাধীন সকল লিটারেচার বা সাহিত্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন তাহলে পুনরাবৃত্তি রোধ করে একটি যৌক্তিক গবেষণা কাঠামো গঠন করা সম্ভব। সাহিত্য পর্যালোচনার ধারণা লাভের জন্য নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে-

৩.১ গবেষণা পর্যালোচনার ধারণা
৩.২ গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রক্রিয়া

৩.১ : সাহিত্য পর্যালোচনার ধারণা (Concepts of Literature Review)

যে কোনো গবেষণার শুরু হয় সাহিত্য পর্যালোচনা দ্বারা। গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই মূলত গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণা সমস্যাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি গবেষণা সমস্যা এবং গবেষণা ক্ষেত্রের তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে সাহায্য করে। গবেষণার বিষয় নির্ধারণের পর সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের সমাধান গবেষণা কর্মকে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করবে-

- কাঙ্ক্ষিত গবেষণাটি আসলেই করা সম্ভব কি না?
- সমস্যাটি কি মৌলিক না কি পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ?
- ইতঃপূর্বে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন তারা কীভাবে/কোন কোন আঙ্গিকে বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করেছেন?
- এ বিষয়ে কী কী গবেষণা করা হয়েছে? পূর্ববর্তী গবেষণার কী কী কাজ রিভিউ করতে হবে?
- এ সমস্যাটিকে আগে কিভাবে সমাধান করা হয়েছে এবং পূর্বের গবেষণায় কী কী সবলতা ও দুর্বলতা রয়েছে? দুর্বলতার প্যাটার্ন কেমন?
- এ গবেষণার কী কী ফলাফল বের হয়েছে? এ ফলাফল কী যৌক্তিক? ফলাফল কী ধরনের গুরুত্ব বহন করে?
- এসব গবেষণাতে গুরুত্বপূর্ণ কী কী তথ্য/তত্ত্ব বাদ পড়েছে?
- এ সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে কি কি তথ্য/উপাত্ত পাওয়া যাবে?
- পূর্ববর্তী গবেষণার সুপারিশে ভবিষ্যতে কী কী ধরনের গবেষণার সুযোগ/সম্ভাবনা রয়েছে?

সাহিত্য পর্যালোচনা নিয়ে নানা ধরনের সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে। Grath (1970, p. 55)-এর মতে, æA review of the literature and related research report is the most important component in designing a research project.”

Mouly (1963, p.112) বলেছেনæA review of related literature is needed to demonstrate the relationship between completed research and the topic under investigation.”

Mouly (1963, p.12) সাহিত্য পর্যালোচনার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট মতো দেন। তার মতে,æThe review of the literature involves locating, reading and evaluating reports of research as well as reports of casual observation and opinion that are relatedto the individual’s planned research project.”

Borg (1963, p.40) সাহিত্য পর্যালোচনার ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন, æThe review of the literature is an exacting task, calling for a deep insight and clear perspective of the overall field.”

Richard M. Grinnell, Peter A. Gabor, Yvonne A. Unrau তাদের Program Evaluation for Social Workers: Foundations of Evidence-Based Pragrams গ্রন্থে সাহিত্য পর্যালোচনার ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন-(1) A search of the professional literature to provide background knowledge of what has already been examined and tested in a specific problem area, (2) Use of any information source, such as a computerized database, to locate existing data or information on a research problem, question, or hypothesis.

সাধারণভাবে সাহিত্য পর্যালোচনাকে বর্তমান গবেষণার সমস্যা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণার বিচার-বিশ্লেষণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা চলে। এটি কোনো গবেষকের নির্দিষ্ট আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোতে মাধ্যমিক উৎস সংশ্লিষ্ট তথ্য/উপাত্তের প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত কাজের ব্যাপক পর্যালোচনার ডকুমেন্টেশন।

গবেষণা পর্যালোচনার উৎস

সাধারণত তিন ধরনের সাহিত্য পর্যালোচনা করা যায়- (১) গবেষণায় ব্যবহৃত তত্ত্ব (Theory), (২) পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অধ্যয়নের সাহিত্যসমূহ (Review of previous researches) ও (৩) সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমুহের সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of literature related to research)। যে সকল উৎস থেকে লিটারেচার পাওয়া যায় সেগুলো হলো : সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জার্নাল, বইপত্র, নিউজ পেপার, সরকারী প্রতিবেদন/প্রকাশনা, শুমারি, রিপোর্ট, সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা/কনফারেন্স প্রসিডিংস, কোম্পানী রিপোর্ট, থিসিস পেপার, গ্রন্থপঞ্জি, ডিকশনারি, ইনডেক্স/মুদ্রিত গবেষণা সারাংশ, ইলেকট্রনিক ডাটাবেইজ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সমসাময়িক পরিসংখ্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

গবেষণা সাহিত্য নির্বাচন

গবেষণার কাজে সাহিত্য পর্যালোচনার সময় সংশ্লিষ্ট সাহিত্য খুঁজে বের করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনো গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার আগেই সেটা কতটা কাজে লাগবে তা জানা জরুরি। যেহেতু গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা একটা সময়সাধ্য এবং ক্লান্তিকর কাজ– সুতরাং যথাযথ সাহিত্য খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে 3R (Relevant, Reliable and Realistic) পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে ফলপ্রসু গবেষণা সাহিত্য খুঁজে বের করা করা সম্ভব–
ক. সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মটি প্রাসঙ্গিক (Relevant) কি না?
খ. গবেষণা কর্মটি নির্ভরযোগ্য (Reliable) কি না?
গ. গবেষণা কর্মটি বাস্তবসম্মত (Realistic) কি না?

রেফারেন্স লেখার নিয়ম

গবেষণা পর্যালোচনার সাথে রেফারেন্স লিখার সম্পর্ক রয়েছে এবং গবেষণার রিপোর্টে রেফারেন্স নির্দিষ্ট নিয়মে লিখতে হয়। রেফারেন্স লেখার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো-Harvard System (http://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-harvard);
Oxford System (http://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-oxford); American Psychological Association (APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/) and Modern Language Association (MLA) (https://owl.english.purdue. edu/owl/resource//2/747)।

সাধারণত মানবিক শাখার গবেষণার রেফারেন্স লিখতে MLAStyleএবং APAStyle শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩.২ : গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রক্রিয়া (Importance and usages)

ইতঃপূর্বে অন্যান্য গবেষণায় কী করা হয়েছে এবং কী করা হয়নি তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে যদি দেখা যায় ইতিমধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট কার্যকর গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে তাহলে এ বিষয়ে গবেষণা করে মেধা, শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় না করাই শ্রেয়। নিম্নে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো–

- গবেষণার ধরণে refocus করতে সাহায্য করে;
- শিরোনাম পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনে সহায়তা করে;
- গবেষণার সঠিকতা যাচাই করে;
- গবেষণা কর্মের প্রণোদনা ও প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে;
- গবেষককে এ বিষয়ের উপর গবেষণার পূর্ববর্তি তত্ত্ব জানতে সহায়তা করে;
- গবেষণার কনটেক্সট বা প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে;
- অন্যান্য গবেষণা সাহিত্যের ভিত্তিতে গবেষণা প্রশ্ন সম্পাদনা বা সংশোধন করতে সহায়তা করে;
- গবেষণার পুনরাবৃত্তি রোধ করে;

- অনাবিস্কৃত জ্ঞান চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়া তথ্য/তত্ত্বের প্রধান ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে;
- গবেষণা নকশার মান উন্নয়ন করে;
- একটি সমস্যার উপর বাস্তবায়িত গবেষণার গভীরতা এবং বিস্তৃতি প্রকাশ করে;
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং হাইপোথিসিসের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করে;
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ব্যাখ্যা/বর্ণনা করতে সাহায্য করে;
- বিদ্যমান ডাটা সেটগুলো ব্যাখ্যা করে।

গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার কৌশল বা পদ্ধতি

গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা কাজটি দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। মূলত: গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনার এই কাজটি চলতে থাকে- তাই এই গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনালব্ধ জ্ঞান সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। অন্যান্য গবেষণা থেকে তত্ত্ব ও তথ্যের পাশাপাশি গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলগত জ্ঞানও একটা গবেষণা কাজ পরিচালনায় কাজে লাগে। সাহিত্য পর্যালোচনার কাজটি সাতটি ধাপ অনুসরণ করে ফলপ্রসূভাবে করা যায়। ধাপ ৭টি হলো:

ধাপ ১: বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যের উৎস চিহ্নিত করা
ধাপ ২: চিহ্নিত প্রতিটি উৎস হতে কী কী তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করা
ধাপ ৩: সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো থেকে কী বিষয়ে নোট নেওয়া হবে তা চিহ্নিত করা
ধাপ ৪: চিহ্নিত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা, প্রয়োজনে পরিমার্জন করা
ধাপ ৫: সংগৃহিত তথ্য পড়া ও বিশ্লেষণ করা (Read and analyze)
ধাপ ৬: তথ্যের সারসংক্ষেপ করা, বিশ্লেষিত উপাত্ত কীভাবে নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হবে তা লিপিবদ্ধ করা
ধাপ ৭: পর্যালোচনা প্রতিবেদন লেখা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সাহিত্য পর্যালোচনা কী?
২। রেফারেন্স লেখার ৩টি পদ্ধতির নাম লিখুন।
৩। APA ও MLA-এর পূর্ণরূপ লিখুন
৪। সাহিত্য পর্যালোচনার কয়েকটি উৎসের নাম উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২। গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩। গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্যাবলি লিখুন।
৪। কী কী পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বনে সাহিত্য পর্যালোচনা করা যায়? লিখুন।
৫। Harvard System এ যে কোনো একটি গ্রন্থ, একটি গবেষণা আর্টিক্যাল, ওয়েবে থাকা তথ্যের রেফারেন্স কীভাবে লিখতে হয় তা উদাহরণসহ লিখুন।

তথ্যসূত্র

১। ড. মো আবু তাহের (২০০৮), সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (১ম সংস্করণ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা
২। ড. খুরশিদ আলম (২০০৩), সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৫ম সংস্করণ), মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৩। এ এস এম আতীকুর রহমান ((২০০৫, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৪র্থ সংস্করণ), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা।
৪। http://www.infosecsa.co.za/files/Reference_Techniques.pdf
৫। http://www.educationbarta.com/feature/advice/1824)
৬। http://www.bdeasy.com/
৭। https://www.porishonkhan.com
৮। http://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-harvard

ইউনিট ৪ : নমুনায়ন (Sampling)

গবেষণাকাজে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা এবং নমুনায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল উপাদান হতে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার কারণে জরিপের পরিবর্তে নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানে নমুনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সামাজিক গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষা গবেষণায়ও নমুনায়নের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমগ্রক (Population)-এর অন্তর্ভুক্ত সকলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে তার একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল অংশের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয় সম্বন্ধে একটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। নমুনায়নকে সমগ্রক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ধারণা লাভের একটি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত কৌশলও বলা চলে। নমুনায়ন বোঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক :

৪.১ সমগ্রক, নমুনায়নের প্রকারভেদ
৪.২ (ক) সম্ভাবনা নমুনায়ন
১.সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন
২.নিয়মতান্ত্রিক/পদ্ধতিগত নমুনায়ন
৩. স্তরীভূত নমুনায়ন
৪ বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন
৪.৩ (খ) নন-সম্ভাবনা নমুনায়ন
১. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন
২. আকস্মিক নমুনায়ন

৪.১ : সমগ্রক ও নমুনায়নের প্রকারভেদ (Population and Types of Sampling)

পরিসংখ্যান এবং জরিপ পদ্ধতিতে নমুনা থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নমুনার মধ্যে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। আর নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা বাছাই করে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। নমুনায়নের তিনটি প্রধান সুবিধা হলো– খরচ কম, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ দ্রুততর হয় এবং তথ্য বা উপাত্তের সঠিকতা এবং গুণমান সহজেই উন্নত করা যায়। নমুনায়ন যে কোনো গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ এটি গবেষণার ফলাফল বা আবিষ্কারের গুণমানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
নমুনায়নের সাথে যে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় জড়িত তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

সমগ্রক (Population/Data world)

সমগ্রক এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Population/Data world। সমগ্রক হলো অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রুপের সকল সদস্য। অর্থাৎ সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো প্রাণি, বস্তু, বিষয় বা ঘটনার সমষ্টি যা থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয় তাকে সমগ্রক বলা হয়। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তথ্য অনুসন্ধানের সাথে সম্পৃক্ত সমগ্র ক্ষেত্রই সমগ্রক। উদাহরণস্বরূপ, গবেষক যদি কোনো একটি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার জানতে চান তাহলে তাকে অন্তত বিগত ৫ বছরের পাস করা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ঐ স্কুল থেকে বিগত ৫ বছরে পাস করা শিক্ষার্থীরাই হবে সমগ্রক। আর যদি কোনো গবেষক ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের মাসিক আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, তাহলে ঢাকা শহরের সকল ভিক্ষুক হবে ঐ গবেষণার সমগ্রক ।

নমুনা(sample)

নমুনার ইংরেজি প্রতিশব্দSample। নমুনা হলো সমগ্রকের একটি অংশ যা পুরো গ্রুপকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যখন ঐ সমগ্রকের একটি অংশ নির্বাচন করা হয় তখন তাকে বলা হয় নমুনা।

Field (2005)-এর মতে, æA sample is a smaller (but hopefully representative) collection of units from a population used to determine truths about that population”. অর্থাৎ নমুনা হলো কোনো সমগ্রকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐ সমগ্রক হতে নির্বাচিত ক্ষুদ্র অংশ।

Bubbie-এর মতে, “A sample is a special subset of a population that is observed for purposes of making inference about the nature of the total population itself”. অর্থাৎ নমুনা বলতে সমগ্রকের একটা বিশেষ সাবসেট বাউপসেট বুঝায়, যাদের সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।

নমুনাকে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে দৈবভাবে ২০০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের জীবনের লক্ষ্য কী জিজ্ঞাসা করা হলে নমুনা হবে ২০০। যদি অ্যাসিড বৃষ্টিপাতের প্রমাণের জন্য ১০০টি স্থানের মাটি সংগ্রহ করা হয়, তাহলে নমুনা হবে ১০০।

নমুনা আকার (Sample Size)

একটি সমীক্ষা বা পরীক্ষণে ব্যবহৃত নমুনার অংশ বা পরিমাণকে নমুনার আকার বলা যায়। নমুনার আকার গবেষণার ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নমুনা আকার গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নমুনার আকার যত বড় হবে নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। নমুনার আকার হলো একটি পৃথক নমুনা সংখ্যা যা একটি সমীক্ষা বা পরীক্ষণে পরিমাপ বা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ: বর্তমান বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট কি না তা যাচাইয়ের জন্য যদি ১০০ জন শিক্ষার্থীদের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়, তাহলে নমুনা আকারটি হবে ১০০। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ফেইসবুক ব্যবহারের প্রভাবের উপর একটি অনলাইন জরিপে ১০,০০০ প্রশ্নাবলি প্রদান করা হয় তবে এ জরিপের নমুনা আকার ১০,০০০। উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগে আক্রান্ত ৫,০০০ শিক্ষার্থীকে জরিপ করলে, নমুনা আকার হবে ৫,০০০।

নমুনা একক (Units)

একটি নমুনায় নির্বাচিত কোনো সমগ্রকের প্রতিটি উপাদানকে একক বলা হয়। একটি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে কোনো গবেষণার সমগ্রক ধরা হলে ঐ বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে এক একটি নমুনা একক বলা যায়।

জরিপ বা শুমারি (Survey)

সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যখন সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত সকল উপাদান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে শুমারি বা জরিপ বলে। জরিপ বা শুমারির মাধ্যমে প্রত্যেকটি একক হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে সংগৃহীত তথ্যে প্রতিটি এককের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়। আদম শুমারিতে জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। জরিপের ক্ষেত্রে অনেক সময়, অর্থ, শ্রম ও লোকবল ব্যয় করতে হয় বলে এ পদ্ধতি ঘন ঘন পরিচালনা করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না।

নমুনায়ন (Sampling)

যে পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য তথ্য বাউপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণীকরণ বা সার্বিকীকরণ করার জন্য চিহ্নিত সমগ্রক হতে প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনায়ন বলে। বৃহৎ অংশ থেকে নমুনা দল বাছাই করার প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে নমুনায়ন।

ধরা যাক, কোনো একটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ৩০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। গবেষক তাদের IQ বের করতে চান। যদি IQ বের করতে ঐ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য বেছে নেন তবে তা হবে শুমারি। আর তিনি যদি ৩০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে IQ পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়ে মূল্যায়ন করেন তা হবে নমুনায়ন।

নমুনায়নের প্রকারভেদ

নমুনায়নের বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি রয়েছে। কোনো গবেষক কোনো পদ্ধতিতে নমুনা দল বাছাই করবেন তা নির্ভর করে ঐ গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, সময় ও বরাদ্দকৃতঅর্থের ওপর। সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনায়নের এ পদ্ধতি বা কৌশল প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

(ক) সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling)ও

(খ) নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-Probability Sampling)

৪.২ (ক). সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling)

যে নমুনায়নে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে এবং নমুনা নির্বাচনে তথ্য সংগ্রহকারীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা পছন্দের কোনো প্রতিফলন ঘটে না, তাকে সম্ভাবনা নমুনায়ন বলে। পক্ষপাত দূরীকরণে দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনার একক নির্বাচন করা হয়। সম্ভাবনা নমুনায়ন প্রধানত চার (০৪) প্রকার। যেমন–

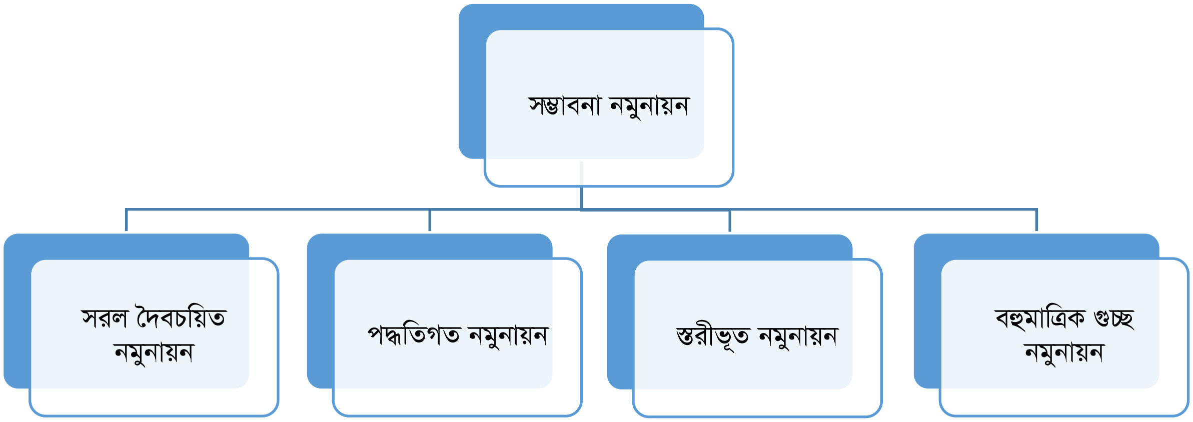
সম্ভাবনা নমুনায়ন
সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন
পদ্ধতিগত নমুনায়ন
স্তরীভূত নমুনায়ন
বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন

সম্ভাবনা নমুনায়নের প্রকারভেদ

৪.৩ (খ).নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-Probability Sampling)

যে নমুনায়নে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে না, তাকে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন বলে। সমগ্রকের আকৃতি ছোট হলে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন কৌশলের ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক। অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা নির্বাচনের সময় থাকে না, তখন জরুরি ভিত্তিতে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন কৌশলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আবার বিশেষ কোনো কারণে সম্ভাবনা নমুনায়ন প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ব্যবহৃত হয়। তবে এ পদ্ধতি বা কৌশলে নমুনা নির্বাচনকার্য তথ্য সংগ্রহকারীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা পক্ষপাতিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল। নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন বেশ কয়েক ধরনের হতে পারে, যথা :

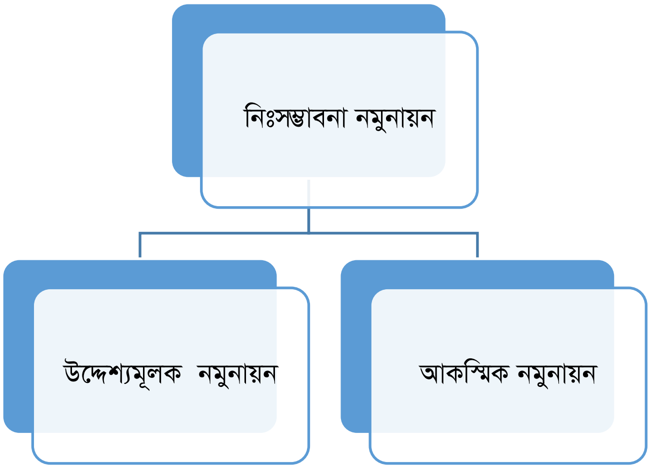
নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন
উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন
আকস্মিক নমুনায়ন

নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের প্রকারভেদ

৪.২ (ক). সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling)

(১) সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন (Simple Random Sampling)

যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে এবং কোনো এককের দলভুক্ত হবার সুযোগ সম্পূর্ণ দৈবের উপর নির্ভরশীল থাকে তাকে সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন বলে। অনেকে এ নমুনায়নকে Chance Sampling বলে থাকেন। এ ধরনের নমুনায়ন প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে থাকে। সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন সাধারণত লটারি পদ্ধতি (Lottery Method) ও দৈবচয়িত সারণি (Random Number Table) পদ্ধতিতে করা যায়।

লটারি পদ্ধতি

সরল দৈবচয়িত নমুনায়নের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো লটারি পদ্ধতি। এতে নমুনা নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা কম থাকে। এ পদ্ধতিতে কয়েকটি ধাপে নমুনা বাছাই করা হয়। ধরা যাক, একটি শ্রেণিতে ৬০০ ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখান থেকে প্রায় ২৫ জনের একটি নমুনা দল গঠন করা হবে। প্রথমত, ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকের জন্য একটি সংখ্যা বা ক্রমিক নির্দিষ্ট করা হবে, দ্বিতীয়ত, ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকের নাম বা তাদের নামের ক্রমিক সংখ্যা একই আকার ও রঙের কাগজ বা কার্ডের উপর লেখা হবে, তৃতীয়ত, কাগজের টুকরা বা কার্ডগুলোকে একইভাবে ভাঁজ করে একটি পাত্রে এলোমেলোভাবে রাখা হবে, চতুর্থত, না দেখে ঐ পাত্র থেকে একটি একটি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্ড বা কাগজের টুকরা (এ ক্ষেত্রে ২৫টি) তোলা হবে। এভাবে পাওয়া ২৫ জন শিক্ষার্থী হবে লটারি পদ্ধতির দৈবচয়িত নমুনা।

দৈবচয়িত সারণি

দৈবচয়িত সংখ্যা সারণিতে সংখ্যাগুলোকে দৈবক্রমিকভাবে কলাম (Column)ও সারি (Column)অনুযায়ী সাজানো হয়। তারপর সমগ্রকের প্রতিটি একককে একটি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এরপর দৈবচয়িত সংখ্যা সারণির যে কোনো সংখ্যা থেকে শুরু করে কলাম বা সারি অনুযায়ী প্রয়োজনমতো সংখ্যা বাছাই করা হয়। পরে দৈবচয়িত সংখ্যাগুলোকে সমগ্রকের ক্রমিক সংখ্যার সাথে মিলিয়ে নমুনা নির্বাচন করা হয়। দৈবচয়িত সারণি ব্যবহার করে ১০ম শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ১০% বা ১০ জনের একটি নমুনা দল গঠন করতে চাইলে ১০০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষার্থীকে ১ থেকে ১০০ ক্রমিক নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। যেহেতু ১০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং ১০০ একটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা, তাই দৈবচয়িত সারণিতে তালিকাভুক্ত সংখ্যার প্রথম তিনটি সংখ্যা ব্যবহার করে নমুনা বাছাই করতে হবে।

আমরা এলোমেলোভাবে দৈবচয়িত সারণির যেকোন সংখ্যার দিকে চোখ নিবিষ্ট করি। এই উদাহরণের জন্য, ধরি সংখ্যাটি ২৩৮১৫। এ সংখ্যার প্রথম তিন ডিজিট ২৩৮ যা সমগ্রক ১০০ এর উপাদান নয়, তাই পরবর্তি সংখ্যা বেছে নিই। এ সংখ্যার প্রথম তিন ডিজিটও ১০০ এর মধ্যে নেই। এভাবে আমরা পরবর্তি সংখ্যাগুলোর দিকে এগিয়ে যাই। দৈবচয়িত সারণির ০৭৩৯০ সংখ্যাটির প্রথম তিন ডিজিট ০৭৩, যা সমগ্রক ১০০ এর মধ্যে। তাহলে আমাদের প্রথম নমুনাটি হবে ০৭৩ ক্রমিকধারী শিক্ষার্থী। এভাবে দৈবচয়িত সারণি পর্যালোচনা শেষে আমরা বাকি ০৪৫, ০৯৮, ০৮১, ০৫২, ০৪৯, ০৪১, ০২৮, ১০০ ও ০৯২ ক্রমিকধারী শিক্ষার্থীর নমুনা পাই। (এ ক্ষেত্রে লাল চিহ্নিত সংখ্যাগুলোর দিকে তাকাই)

দৈবচয়িত সারণি (আংশিক)						
৫৩৭২০	৭৯৬১১	২৮৪৯২	২৮৭৫১	৮১০৮৪	৯৭৫০৯	২১৬৭৯
৭৬৪০৭	৬৪৬৫৯	৯৯৯০৪	৬৭৬০৪	১১৪০৩	৮০০১৬	১০০২৩
২৩৮১৫	৬৯৩৩৬	৫৯৩১৯	১৫৯৩৪	১৯৫৪৩	৮২১৫২	৯৪৩০৫
৮৫৭৬০	৫৬৯২৪	৬৯৯৯৯	৮৩৮৮৩	১৫৬৭৫	৬৭২০০	৬৫৭২৭
২৫৫৪৭	৯০৬৯৬	৬৮৬৭২	০৮১৯৯	৮৯৬২৮	৭১৮৭৬	৯৮৫৭৭
৫৩৩১৫	০৭৩৯০	৪৫১৭৫	০৫২৫৪	৫১৫৮৪	৮৬০২০	০৯২৬৭
৩২৩৫৯	৪৩৭০৩	৩৬২২৭	৫৮৬৫৫	৯১৩৬০	৯৩২৩৭	৩৪৪৯৫
৭৫৭৪৪	১৩৫৩৯	৭৩৬০৮	১৯৯৪৭	৫৪৩৮৩	০৪১৮৬	৫৪৭৮৮
১২০৬৭	০৪৫৯০	২৭০১৯	৫৯৭২৩	৮৮১৫৬	০২৮৫৯	০৫৬৫৮
৩১২৯১	৪৬৯০৭	২৬৬১৫	৮৭৪৯২	৭৮২৮৪	৭৯৩৫২	৭৬১৪৮
৯৬৭০০	৭৭২১৬	৮২৫৫৬	৬৬৫৩৬	১৪৬০৭	৭০৪০৪	২৯৫৬০
১৮৪৭৫	৮৫৩৫৬	৮৪৬৯২	৬০১২৮	৬০৩৮৭	১২৭৩০	২৯১৫৫
৮৬৪২৪	৮১৪৮৮	৬৯৭৪০	০৪৯৯৫	৯৯২৪০	৪৩০৩৯	১১৬৬২
৩৭২৯৫	৫৫৪৫১	০৯৮২	৬৪৪০০	২১০১৫	৫১১৭৯	১৩৭৯৮
২৫৯৫১	৬২৯২৭					

উল্লেখ্য যে, দৈবচয়িত সারণি ব্যবহার করে নমুনা নির্বাচনে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। নমুনা নির্বাচনে কেউ কেউ দৈবচয়িত সারণির শেষের তিন ডিজিটও ব্যবহার করতে পারেন।

সুবিধা

- এটি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত সহজ সরল পদ্ধতি যার ফলে নমুনা নির্বাচনে কোনো সমস্যা হয় না
- এ নমুনায়ন যেহেতু পক্ষপাত ও পূর্বধারণামুক্ত, তাই এ পদ্ধতি নিরপেক্ষ
- এখানে সমগ্রকের প্রতিটি একক নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান ও স্বাধীন সম্ভাবনা থাকে
- নমুনা নির্বাচনে সমগ্রকের শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়োজন হয় না বলে শ্রেণিবিন্যাসজনিত ভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না
- এ পদ্ধতিতে খুব সহজেই নমুনা বিচ্যুতি নিরূপণ করা যায়
- এটি পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য খুবই উপযোগী

অসুবিধা

- সরল দৈবচয়িত নমুনায়নে সমগ্রকের পূর্ণ তালিকা করতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সমগ্রকের পূর্ণ তালিকা সব সময় পাওয়া যায় না
- সমগ্রকের আকার বেশি বড় হলে নমুনায়নের জন্যে স্লিপ তৈরি করা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ
- নমুনা একক বা আইটেম বিক্ষিপ্ত থাকলে নমুনা নির্বাচন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে
- সংখ্যাতাত্ত্বিক হওয়ায় তাতে নমুনার সংখ্যা বেশি করে সংগ্রহ করতে হবে
- সমগ্রকের একক বা উপাদানের প্রকৃতি সমজাতীয় না হলে অর্থাৎ সমসত্ত্ব না হলে এ পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন কঠিন হয়ে পড়ে।

(২) নিয়মতান্ত্রিক নমুনায়ন/ পদ্ধতিগত নমুনায়ন (Systematic Sampling)

পদ্ধতিগত নমুনায়ন হলো এমন এক ধরনের সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন পদ্ধতি যেখানে একটি বড় সমগ্রককে কোনো একটি ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিব্যপ্তিতে দৈবচয়িত পন্থায় নমুনার এককসমূহ বা উপাদান নির্বাচন করা হয়। এই শ্রেণিব্যপ্তি যাকে নমুনা ব্যপ্তি বলা হয় তা সমগ্রক ও নমুনার আকারের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, নমুনা ব্যপ্তি হলো সমগ্রকের আকার/নমুনা আকার।

ধরা যাক, দশম শ্রেণির ৯৬ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান মেলার প্রতি তাদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য তাদের মধ্য হতে পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে ১২ জনের একটি নমুনা বাছাই করা হবে।

প্রথমত, ৯৬ জন শিক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর সংবলিত একটি পূর্ণ তালিকা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ১, ২, ৩, ৪, …….. ৯৬ ক্রমিক লিখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নমুনা ব্যপ্তি নির্ণয় করতে হবে, এখানে নমুনা ব্যপ্তি হবে (৯৬/১২)=৮।

তৃতীয়ত, এ পর্যায়ে দৈবচয়িত পদ্ধতিতে প্রথম নমুনাটি বাছাই করতে হবে। ধরা যাক দৈবচয়নে নেওয়া প্রথম নমুনা এককটি হলো ৯ ক্রমিকধারী একজন শিক্ষার্থী।

চতুর্থত, নমুনা ব্যাপ্তি অনুযায়ী পরবর্তী নমুনা একক বাছাই করা। আলোচ্য ক্ষেত্রে নমুনা ব্যাপ্তি অনুযায়ী পরবর্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় নমুনা একক হবে (৯ + ৮) বা ১৭ তম ক্রমিকধারী শিক্ষার্থী। এভাবে (১৭ + ৮) বা ২৫ তম, (২৫ + ৮) বা ৩৩ তম, (৩৩ + ৮) বা ৪১তম....... ইত্যাদি ক্রমিকধারী ১২ জন শিক্ষার্থীর এককগুলো নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এই প্রক্রিয়ায় ১২ জন শিক্ষার্থীর একটি নমুনা প্রস্তুত করা হলে তা হবে পদ্ধতিগত নমুনায়ন। মনে রাখা দরকার, নমুনা একক নির্বাচন করতে করতে সমগ্রকের শেষে চলে গেলে আবার তালিকার শুরুর দিকে চলে আসতে হবে।

সুবিধা

- পদ্ধতিগত নমুনায়ন স্তরীভূত বা সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন চেয়ে অনেক সহজ
- সময়, শ্রম ও ব্যয় কম হয়
- ছোট আকৃতি সমগ্রক থেকে নির্বাচন করা সহজ হয়
- এ কৌশল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক

অসুবিধা

- যদি কোনো ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটে এবং ঠিক ঐ ব্যবধান বিবেচনা করে যদি নিয়মতান্ত্রিক নমুনায়ন করা হয় তাহলে তা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে যায়। যেমন– বাংলাদেশে দৈনিক কতজন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে তা যদি কেবল জুমা'র নামাজ দিয়ে করা হয় তাহলে তা কার্যত প্রতিনিধিত্বমূলক হবে না।
- প্রথমের নমুনাটি দৈব পদ্বতিতে করা হলেও এরপরে তা আর দৈব পদ্ধতিতে করা হয় না, যার ফলে এক ধরনের সাংঘর্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) স্তরীভূত নমুনায়ন (Stratified Sampling)

স্তরীভূতনমুনায়ন একটি সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন কৌশল যার মাধ্যমে পুরো সমগ্রককে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী বা স্তরে বিভক্ত করা হয়, তারপর দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রতিটি উপগোষ্ঠী বা স্তর থেকে প্রয়োজনীয় নমুনার একক বা উপাদান নির্বাচন করা হয়। এ পদ্ধতিতে গবেষক সমগ্রককে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেন। এ স্তরকে ইংরেজিতে strata বলে। এই strata বা স্তর হতে দৈবভাবে নমুনা একক বাছাই করা হয়। সমগ্রকের উপাদানসমূহ সমজাতীয় না হলে অর্থাৎ উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হলে স্তরিত নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করা হয়। স্তরীভূতনমুনায়নে এক স্তর হতে অন্য স্তরের মধ্যে অসমতা (Heterogeneity) থাকে কিন্তু প্রতিটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগুলোর মধ্যে সমতা (Homogeneity) থাকে।

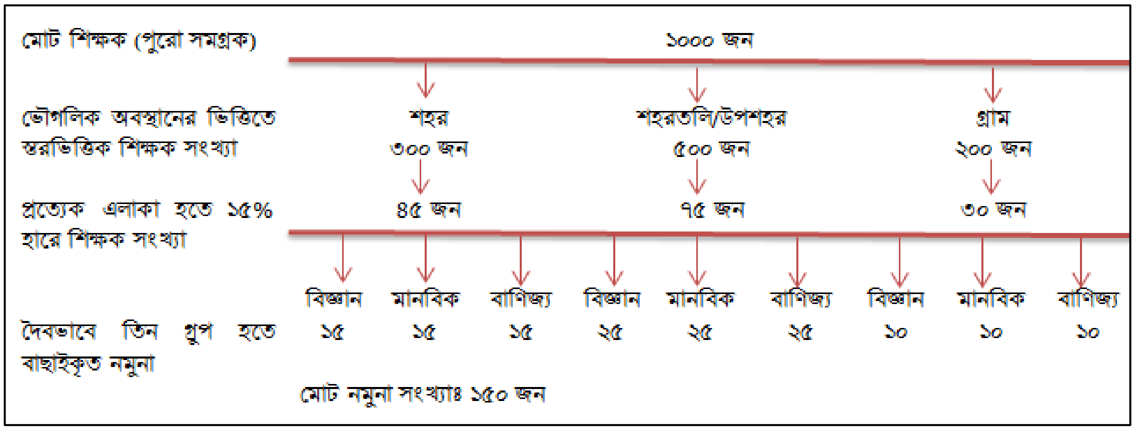
মোট শিক্ষক (পুরো সমগ্রক)
১০০০ জন
ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে স্তরভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা
শহর
৩০০ জন
শহরতলি/উপশহর
৫০০ জন
গ্রাম
২০০ জন
প্রত্যেক এলাকা হতে ১৫% হারে শিক্ষক সংখ্যা
৪৫ জন
৭৫ জন
৩০ জন
বিজ্ঞান
মানবিক
বাণিজ্য
বিজ্ঞান
মানবিক
বাণিজ্য
বিজ্ঞান
মানবিক
বাণিজ্য
দৈবভাবে তিন গ্রুপ হতে বাছাইকৃত নমুনা
১৫
১৫
১৫
২৫
২৫
২৫
১০
১০
১০
মোট নমুনা সংখ্যাঃ ১৫০ জন

উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি সমগ্রকের তিনটি স্তর যথাক্রমে ১০০, ২০০ এবং ৩০০ আছে। ১ : ২ অনুপাতে নমুনা নিতে চাইলে, গবেষককে অবশ্যই প্রতিটি স্তর থেকে যথাক্রমে ৫০, ১০০ এবং ১৫০টি নমুনা নির্বাচন করতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি স্তর বা উপবিভাগ থেকে নমুনা সংগ্রহ করাকে স্তরিত নমুনায়ন বলা হয়।

শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে ডিজিটাল কনটেন্টের প্রয়োগ বিষয়ে সিলেট জেলার ১০০০ হাজার শিক্ষকের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতির ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে।

স্তরীভূতনমুনায়ন প্রধানত দুই ধরনের হতে পারে যথাঃ সমানুপাতিক (Proportionate) স্তরীভূতনমুনায়ন ও অসমানুপাতিক (Disproportionate) স্তরীভূতনমুনায়ন।

সমানুপাতিক স্তরীভূত নমুনায়ন (Proportionate Stratified Sampling)

সমগ্রক থেকে নমুনা বাছাই কালে নমুনার আকার প্রতিটি স্তর বা উপস্তরের সাথে সমানুপাতিক হারে নির্বাচন করা হয় তখন সেই নমুনায়ন পদ্ধতিকে সমানুপাতিক স্তরীভূতনমুনায়ন বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে একই অনুপাত বিদ্যমান থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ঢাকায় বসবাসরত লোকসংখ্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর গবেষণা করতে গেলে সমগ্রককে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিসেবে স্তরবিন্যাস করা যায়। প্রতিটি স্তরের আকার যথাক্রমে ২০০, ৪০০ ও ৬০০ ধরা হলো। প্রতিটি স্তরের মধ্যে থেকে অর্ধেক অনুপাত করে নমুনা বাছাই করা হলে নমুনায় ১০০ জন উচ্চবিত্ত, ২০০ জন মধ্যবিত্ত ও ৩০০ জন নিম্নবিত্ত নির্বাচন করতে হবে।

অসমানুপাতিক স্তরীভূত নমুনায়ন (Disproportionate Stratified Sampling)

সমগ্র তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা বাছাই কালে সমগ্রকের প্রতিটি স্তর থেকে সমানুপাতিক হারে নমুনা নির্বাচন না করে অসমানুপাতিক হারে নমুনা নির্বাচন করা হয় তখন সেই নমুনায়ন পদ্ধতিকে অসমানুপাতি স্তরীভূতনমুনায়ন বলে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান বিষয়ে মনোভাব যাচাইয়ের জন্য একটি বিদ্যালয়ের ৪১০ জন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১২০ শিক্ষার্থীর নমুনা অসমানুপাতিক স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে করতে হলে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী করা যেতে পারে। এখানে ৪১০ শিক্ষার্থীকে শ্রেণি অনুযায়ী ৫টি স্তরে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি স্তরের অনুপাত অনুযায়ী নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রতি স্তর হতে দৈবভাবে নমুনা নির্বাচন করা হয়।

শ্রেণি	শিক্ষার্থী সংখ্যা	প্রতি স্তরের অনুপাত	নমুনা সংখ্যা
খষ্ঠ	১০০	০.২৪	১২০ × ০.২৪ = ২৯
গপ্তম	৯০	০.২২	১২০ × ০.২২ = ২৭
অষ্টম	৮০	০.২০	১২০ × ০.২০ = ২৪
নবম	৭০	০.১৭	১২০ × ০.১৭ = ২০
দশম	৭০	০.১৭	১২০ × ০.১৭ = ২০
মোট	৪১০ জন		মোট নমুনা = ১২০ জন

সুবিধা

- সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি নমুনা নির্বাচনে পক্ষপাত প্রবণতা হ্রাস করে
- এটি নমুনায়ন ত্রুটি হ্রাস করে এবং বড় মাত্রায় নমুনার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে
- এ পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করলে সমগ্রকের কোনো স্তরই বাদ পড়ে না। এতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে বলে নমুনার নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়
- সমানুপাতিক ও অসমানুপাতিক উভয় প্রকার নমুনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়
- নমুনায় উপস্তরগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত থাকে বলে নমুনার নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা

- পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে অনেক সময় নমুনা নির্বাচনে সময় বেশি লাগে
- নির্ভুলতা নিশ্চিতের জন্যে গবেষককে সমগ্রকের গঠন, প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয় বিধায় এ নমুনায়ন কঠিন হয়ে পড়ে
- এতে সমগ্রকের সকল উপাদান এবং সকল উপস্তরের উপাদান সনাক্ত করা কঠিন হতে পারে
- এ নমুনায়নে বিন্যাসজনিত ত্রুটি থাকতে পারে।

(৪) বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন (Multi Cluster Sampling)

বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন সামাজিক গবেষণার নমুনা নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরো সমগ্রক যখন ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত ও বৃহৎ হয়, ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্রকটি সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকে বা সমগ্রক অজানা থাকে এবং সমগ্রকের গুচ্ছগুলোর মধ্যে সমরূপতা থাকে তখন গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা নির্বাচন করা হয়। এটি এমন একটি নমুনা পদ্ধতি যেখানে সমগ্রকের বিভিন্ন ভাগ বা গুচ্ছকে নমুনা একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে সমগ্রককে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভক্ত প্রতিটি ভাগকে এক একটি গুচ্ছ বা ক্লাষ্টার বলা হয়। আর নমুনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাই করে বাছাইকৃত গুচ্ছ হতে নমুনা নির্বাচন করা হলে তাকে বহুমাত্রিক গুচ্ছ নমুনায়ন বলে। এ নমুনায়নে একটি গুচ্ছ হতে আরেক গুচ্ছের মধ্যে সমতা(homogeneity)থাকে কিন্তু গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগুলোর মধ্যে অসমতা (heterogeneity)থাকে।

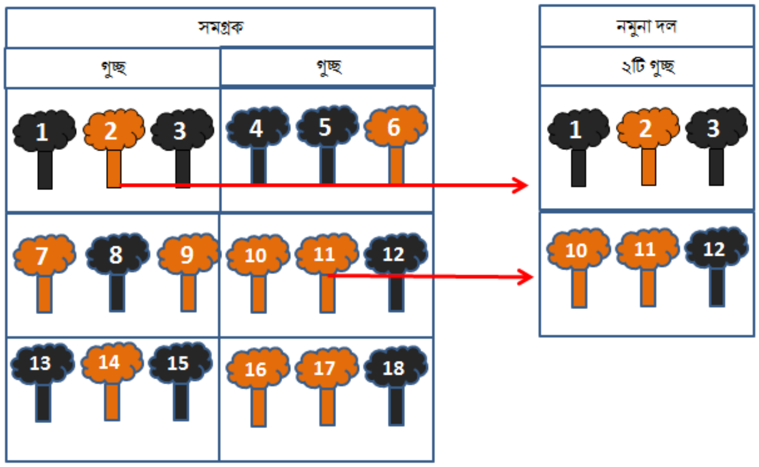

উপরের ছবিতে সমগ্রককে ছয়টি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে, প্রতি গুচ্ছে তিনটি করে সদস্য রয়েছে। সেখান থেকে নমুনা দলে দুইটি গুচ্ছ বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত ২টি গুচ্ছের সকল সদস্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আমরা যদি ঢাকা বিভাগের ৩০০০ স্কুলের শিক্ষকদের আয় সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি ৩০০০ স্কুলকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বিবেচনা করা হয় তাহলে প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক হবেন একটি গুচ্ছের সদস্য। এই গুচ্ছগুলো হতে সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০০টি স্কুল নির্বাচন করা যেতে পারে। এই ১০০টি স্কুলের শিক্ষকদের আয় গবেষণার বিষয়ের জন্য প্রাথমিক উৎস বা তথ্য হতে পারে।

সুবিধা

- এই নমুনা কৌশল ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং সহজ
- বিশাল এলাকা থেকে নমুনা চয়ন করা যায়
- নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতার মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়
- সমগ্রক সম্পর্কে অস্পষ্টতা বা সমগ্রক অজানা থাকলেও গুচ্ছ নমুনা নির্বাচন করতে কোনো অসুবিধা হয় না

অসুবিধা

- এতে নমুনা ত্রুটির সম্ভাবনা বেশি থাকে
- ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে করা হয় বলে নমুনার আয়তনের উপর গবেষকদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না
- নির্বাচিত এলাকার সকল অধিবাসীদের কাছ থেকে একই সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না যার ফলে একাধিকবার একই ব্যক্তি নমুনা গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে

৪.২(খ) নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-Probability Sampling)

অনেক ক্ষেত্রে গবেষক নমুনা দল গঠনে সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের পরিবর্তে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে গবেষক তার নিজস্ব বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধান ক্ষেত্রের তথ্য বিশ্ব হতে নমুনা সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে নমুনার আকার ছোট হলে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন বেশি উপযোগী হয়। নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন দুই ধরনের হতে পারে– ১. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ও ২. আকস্মিক নমুনায়ন।

১. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling)

সম্ভাবনাতত্ত্বকে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন করা হয়। গবেষক উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পছন্দ ও অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে যে পদ্ধতিতে নমুনা বাছাই করেন তাকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন বলা হয়।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন হলোএকটি নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি যা সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য ও গবেষণার বিষয়ের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নকে অনেক সময় সিদ্ধান্তমূলক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নমুনায়নও বলা হয়।

ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এ থেকে সকলের মাসিক ব্যয় জানা সম্ভব নয়। গবেষকের ইচ্ছে হলো ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করবেন। গবেষক তার পছন্দমতো ১০০ জনকে নির্বাচিত করলেন এবং তাদের কাছ থেকে মাসিক ব্যয় এর তালিকা নিয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করলেন। এখানে গবেষক নমুনা দল গঠনে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

সুবিধা

১. এ নমুনায়নে সময় ও খরচ কম লাগে
২. বড় আয়তনের সমগ্রকের ক্ষেত্রে অনেক গবেষক উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন
৩. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের প্রধান সুবিধা হলো, গবেষক দ্রুত তার কাঙ্ক্ষিত নমুনায় পৌঁছাতে পারেন।

অসুবিধা

- পূর্বধারণা বা পক্ষপাত বা ব্যক্তিগত ঝোঁক দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- নমুনার মধ্যে সব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা নেই
- বড় সমগ্রকের জন্য উপযুক্ত নয়
- নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করা যায় না।

২. আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental Sampling)

গবেষক অনেক সময় নমুনায়নের বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী ইচ্ছামতো এবং যা কাছে পাওয়া যায় সেগুলোকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এটি প্রতিনিধিত্বমূলক বা বিজ্ঞানসম্মত না হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ উপযোগী বলে প্রমাণিত।

আকস্মিক নমুনায়ন এক ধরনের নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি যেখানে নমুনা এককের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায় বা নাগাল পাওয়া যায় বা ব্যবস্থাপনা করা সহজ হয়। এসব বিবেচনা করে নমুনা বাছাই করা হয়। বিদ্যালয়ের যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে মনোভাব যাচাইয়ের জন্য নিজের সুবিধামতো এবং যাকে কাছে পাওয়া যায় তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো আকস্মিক নমুনায়ন পদ্ধতি।

উদাহরণস্বরূপ সুনাগরিক তৈরিতে স্কাউটিংয়ের ভূমিকা বিষয়ে কোনো বিদ্যালয়ের ১০০০জন শিক্ষার্থীর মধ্য হতে ১০০ জন শিক্ষার্থীর মনোভাব জানতে যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে বা নিজের সুবিধামতো যে কাউকে উত্তর করার জন্য জিজ্ঞাসা করা আকস্মিক নমুনায়ন পদ্ধতির একটি উদাহরণ হতে পারে।

সুবিধা

- অত্যন্ত দ্রুত ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য
- সহজেই নমুনাপাওয়া যায়
- খরচ কম।

অসুবিধা

- প্রতিনিধিত্বশীল ও বিজ্ঞানসম্মত নয়
- নমুনা ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে
- নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা কম থাকে
- পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুব বেশি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সমগ্রক, নমুনা একক ও নমুনা আকার কী?

২। নমুনায়ন কী?

৩। নমুনায়ন কত প্রকার ও কী কী?

৪। সরল দৈব নমুনায়নের ২টি সুবিধা লিখুন।

৫। সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখুন।

৬। শুমারি জরিপ ও নমুনা জরিপ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক গবেষণায় নমুনায়ন ও জরিপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. নমুনায়নের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

৩. উদাহরণসহ গুচ্ছ নমুনায়ন ও স্তরিত নমুনায়নের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪. উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার নমুনায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

৫. উদাহরণসহ সম্ভাবনা নমুনায়ন ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের মধ্যে পার্থক্য করুন।

৬. ‘দৈবচয়ন নমুনায়ন সকল সম্ভাবনা নমুনায়নের ভিত্তি’-ব্যাখ্যা করুন।

৭. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ১০০০ জন শিক্ষার্থীর গড় বয়স বের করার জন্য ১০০ শিক্ষার্থীর নমুনা নির্বাচন করতে হবে। এ নমুনা নির্বাচনে আপনি নমুনায়নের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করবেন এবং কেন ব্যবহার করবেন?

তথ্যসূত্র

১। ড. মো আবু তাহের (২০০৮), সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (১ম সংস্করণ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা

২। ড. খুরশিদ আলম (২০০৩), সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৫ম সংস্করণ), মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা

৩। এম. হাসান আলী, মোঃ নাসির উদ্দিন, ড. মোঃ ফিরোজুল ইসলাম (২০১০), সামাজিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি (সমাজবিজ্ঞান) (৩য় প্রকাশ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা

৪। জিনাত জামান (১৯৮৭), শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল (১ম প্রকাশ), শিল্পতরু, ঢাকা

৫। এ এস এম আতীকুর রহমান (২০০৫), সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৪র্থ সংস্করণ), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

ইউনিট-৫ : উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও পদ্ধতি
(Tools of Data Collection and Methods)

নিয়মতান্ত্রিক ধাপ ও কৌশল অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ধাপের কাজ একটির সাথে অপরটি সম্পর্কিত। একটি গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার পর অনুমিত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এরপর বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহে কী কী কৌশল অনুসরণ করবেন, তা নির্ভর করে গৃহীত সমস্যার ধরন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও নমুনায়নের উপর। এই ইউনিটে উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

৫.১ প্রশ্নমালা : ধরন ও ব্যবহার
৫.২ সাক্ষাৎকার : ধরন ও ব্যবহার
৫.৩ পর্যবেক্ষণ : ধারণা ও ব্যবহার
৫.৪FGD : ব্যবহার, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা
৫.৫ ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ : ডকুমেন্ট বিশ্লেষণের নিয়ম ও সর্তকতা অবলম্বন

৫.১ : প্রশ্নমালা : ধরন ও ব্যবহার

উত্তর সংগ্রহের আশায় বিভিন্ন উত্তরদাতার উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রশ্নবাচক বিবৃতির সমষ্টি বা তালিকাকে প্রশ্নমালা বলে। সমাজ ও শিক্ষা গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে প্রশ্নমালা ব্যবহার একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা। একজন গবেষককে এই কাজটি অত্যন্ত সর্তকতার সাথে করতে হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল যদি সঠিক না হয় তাহলে গবেষণাটি যথার্থতা হারায়। তাই গবেষক গৃহীত সমস্যাটির উদ্দেশ্যে ও নমুনায়ন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ নির্বাচিত করেন। উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল আছে। যথা: প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, এফজিডি, ডকুমেন্ট স্টাডি ইত্যাদি। তন্মধ্যে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হচ্ছে প্রশ্নমালা। সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রশ্নমালা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্নমালার ধরন

উত্তর পাওয়ার আশায় বিভিন্ন লোকের উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রশ্নের সমষ্টি বা তালিকাকে প্রশ্নমালা বলা হয়। বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক ও শিক্ষা গবেষণায় প্রশ্নমালার বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্রশ্নমালার অন্যতম দুটি উদ্দেশ্য হলো: বর্ণনা ও পরিমাপন।

শিক্ষা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকাঠামো ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নমালার ধরন দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়। যথা:

- উত্তরের ধরন
- প্রশ্নমালা বিতরণ পদ্ধতি

উত্তরের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা:

- নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা (Fixed questionnaire)
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (Open-ended questionnaire)
- মিশ্র প্রশ্নমালা (Mixed questionnaire)

নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা(Fixed questionnaire)

নির্ধারিত প্রশ্নমালাতে প্রত্যেক প্রশ্নের সাথে সম্ভাব্য কিছুসংখ্যক উত্তর লিপিবদ্ধ থাকে। উত্তরগুলোর মধ্য থেকে উত্তরদাতার বিবেচনায় প্রশ্ন অনুযায়ী যে উত্তরটি সব থেকে বেশি প্রযোজ্য সেটিতে টিক (✓) দেওয়ার নির্দেশনা থাকে। এ ধরনের প্রশ্নমালা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। নির্ধারিত প্রশ্নমালা গবেষক ব্যবহার করেন কেবলমাত্র তখনই যখন তিনি প্রশ্নের উত্তরের ধরন সম্পর্কে যথাযথ পূর্বানুমানে পৌছাতে পারেন এবং নিশ্চিতথাকেন যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে উত্তরদাতার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে।

উদাহরণঃ

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি প্রয়োগ উপযোগিতা যাচাই

মতামতমালা

(প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

বিদ্যালয়ের নাম : ....
শিক্ষার্থীর নাম : ....
শ্রেণি : .... রোল নং-...
(প্রতিটি উক্তির ডান পার্শ্বের যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর)

উক্তি নং	উক্তিসমূহ	হ্যাঁ	না
১.	তোমার পাঠ্য পুস্তকে আইসিটি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু আছে।		
২.	কম্পিউটারের ব্যবহার বিদ্যালয়ে হাতে কলমে করা উচিত		
৩.	কম্পিউটারের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা আছে।		
৪.	ইন্টারনেট শব্দটির সঙ্গে পরিচয় আছে		
৫.	ইন্টারনেট ব্যবহার করে যোগাযোগ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে		
৬.	মোবাইলে গেম খেলতে ভালো লাগে		
৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকগণ পাঠদান কালে উৎসাহিত হন		
৮.	আইসিটি ব্যবহার করে শ্রেণিতে পাঠদান করলে ভালো হয়		
৯.	সপ্তাহে তিন দিন কম্পিউটার ক্লাস থাকলে ভালো হয়		
১০.	বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে		

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ....তথ্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ....

তারিখঃ .... তারিখঃ....................

নির্ধারিত প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Fixed Questionnaire)

নির্ধারিত প্রশ্নমালার সুবিধা (Merits of Fixed Questionnaire)

- নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে অতি সহজে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। উত্তরসমূহ নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বিধায় উত্তরগুলোকে অতি সহজে সংকেত দ্বারা চিহ্নিতকরণ (coding) সম্ভব হয়। সংকেতায়নের সময় গবেষক প্রত্যেক উত্তরের বিপরীতে সুবিধামতো একটি সংখ্যা ব্যবহার করেন।
- এই ধরনের প্রশ্নমালা থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সাহায্যে অতি সহজেই সারণি (Table) প্রস্তুত করা সম্ভব, যার মাধ্যমে তথ্যসমূহের পারস্পরিক তুলনা ও বিশ্লেষণ সহজতর হয়।
- এক্ষেত্রে উত্তরদানের জন্য উত্তরদাতাকে বেশি কিছু লিখতে হয় না, শুধু নিজের পছন্দের উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন দিলেই চলে। এ কারণেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকরাও এ পদ্ধতিতে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করতে পারেন।
- উত্তর প্রদানের জন্য যেহেতু উত্তরদাতাকে তেমন কিছু লিখতে হয় না, সেহেতু স্বল্প সময়েই উত্তরদাতার পক্ষে সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান সম্ভব হয়। ফলে উত্তরদাতাগণ এসব প্রশ্নমালাতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন।
- ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালা যদি নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা হয়, তবে উত্তরদানকারীর পক্ষ থেকে পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

নির্ধারিত প্রশ্নমালার অসুবিধা (Demerits of Fixed Questionnaire)

- নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালার প্রশ্নসমূহের সম্ভাব্য উত্তর সবসময় খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তর প্রশ্নমালা থেকে বাদ পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে উত্তরদাতা তাঁর জন্য যে উত্তরটি প্রযোজ্য সেটির অভাবে এমন উত্তর বেছে নেন যা আদৌ প্রযোজ্য নয়। এমতাবস্থায় সংগৃহীত তথ্য গবেষণার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- এ প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতার মধ্যে একই ধরনের উত্তরদান প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন– বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নের দিকে ঠিকমতো না তাকিয়েই তিনি উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে ফেলতে পারেন।

উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (Open Ended Questionnaire)

উন্মুক্ত প্রশ্নমালায় প্রশ্নের শেষে কোনো প্রকার উত্তর দেওয়া থাকে না। উত্তরদাতার উত্তর কতটুকু হবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেওয়া যায় না। তবে প্রত্যেক প্রশ্নের শেষে উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু জায়গা নির্ধারিত থাকে যা উত্তরদাতা কর্তৃক পূরণীয়। যেমন– এসএসসি পর্যায়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির অবনতির কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা অনেক কিছুই লিখতে পারেন। অনেক গবেষক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করতে বলেন। তাই উত্তরদাতাকে প্রশ্নের জবাব ছোট বা বড় আকারে লিখতে হয়।

উদাহরণ :

১. গাড়ি ড্রাইভিং এর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কেন উচিত নয়? লিখুন।

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Open Ended Questionnaire)

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সুবিধা (Merits of Open Ended Questionnaire)

- নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা যেখানে তথ্য সংগ্রহে অক্ষম, সেখানে উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাগণ উত্তরদানের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার অসুবিধা (Demerits of Open Ended Questionnaire)

- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতির সব থেকে বড় ধরনের অসুবিধা হলো এই যে, এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সংকেতায়ন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা খুবই কঠিন।
- গবেষণার এলাকাভুক্তপ্রতিজন উত্তরদাতাই যদি শিক্ষিত হন, কেবল সেক্ষেত্রেই উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ অশিক্ষিত উত্তরদাতার পক্ষে লিখিতভাবে উত্তর প্রদান করা সম্ভব নয়।
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পূরণ করতে অনেক সময়ের দরকার হয়। তাই এই প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদানে অনেকেই অসম্মতি জানান।
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ডাকযোগে উত্তরদাতার বরাবর পাঠালে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম।
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালায় উত্তরদাতার উত্তর ভিন্নরকম হয় যা এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ করা দুরূহ ও কঠিন হয়।

মিশ্র প্রশ্নমালা(Mixed Questionnaire)

যে ধরনের প্রশ্নমালায় তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ও উন্মুক্ত এই উভয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়, তাকেই আমরা মিশ্র প্রশ্নমালা হিসেবে অভিহিত করি। গবেষক মূলত কোনো নির্ধারিত প্রশ্নের সূত্র ধরেই উন্মুক্ত প্রশ্ন করে থাকেন।

উদাহরণ :

২. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার সমর্থন করেন কী?
সমর্থিত উত্তরে টিকচিহ্ন দিন ☐ হ্যাঁ ☐না
উত্তর না হলে কেন করেন না ? লিখুন।
•……………………………………………………………………
•……………………………………………………………………
•……………………………………………………………………
•……………………………………………………………………
•……………………………………………………………………

প্রশ্নমালা বিতরণের পদ্ধতি

উত্তরগ্রহীতাকে প্রশ্নমালা বিতরণে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যথা:

- ডাকযোগে বিতরণ
- সরাসরি বিতরণ

আগে প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরণ করে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু এখন বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে যাওয়ায় ডাকযোগে প্রশ্নমালার উত্তর গ্রহণ ব্যবহার কমে গেছে। মূলত মানুষ এখন ব্যাপক হারে আইসিটি নির্ভর প্রযুক্তি মোবাইল, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফেসবুক, স্কাইপি ইত্যাদি ব্যবহার করছে, তাই মানুষ এখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ডাকঘরে যায় না বললেই চলে। তাই প্রশ্নমালার সাহায্যে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সরাসরি তথ্যপ্রদানকারীর নিকট পৌঁছে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহকারীর কোনো প্রকার সাহায্য ছাড়াই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Questionnaire)

- প্রশ্নমালার লেখার পরিমাণ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে
- প্রশ্নের সংখ্যা যথাসম্ভব কম থাকা বাঞ্ছনীয়
- প্রশ্নগুলো এমন হওয়া দরকার যার মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ততথ্যই সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- প্রশ্নগুলো সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে
- এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর দেওয়া কোনো প্রকার পক্ষপাতদুষ্টতা (biasness) ছাড়াই সম্ভব হয়
- প্রশ্নমালায় টেক্‌নিক্যাল শব্দাবলির প্রয়োগ সর্তকতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্নমালা যদি বিশেষ কোনো শ্রেণি বা বিশেষজ্ঞের বরাবর প্রেরণ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে টেক্‌নিক্যাল শব্দাবলি ব্যবহার যোগ্য
- প্রাপ্ত উত্তরগুলোর সঠিকতা ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করার উপযোগী কিছু প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়
- কৌশল বা ফাঁদ (strategy) হিসেবে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলো পর পর ব্যবহার করা ঠিক নয়
- যতদূর সম্ভব অধিক সংগঠিত প্রশ্ন দেওয়াই শ্রেয়। এতে উত্তরসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়
- যেসব ক্ষেত্রে একটি বাক্য (হ্যাঁ/না) ব্যবহার করে উত্তর প্রদান করা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো সংগঠিতকরে দেওয়াই ভালো যাতে উত্তরদাতা একটি টিক চিহ্ন ব্যবহার করে উত্তর দিতে পারে
- সব প্রশ্নই বিশ্লেষণমূলক হওয়া দরকার। অর্থাৎ এগুলো অবশ্যই গবেষণার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে
- প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে (chronologically) সাজাতে হবে
- উত্তরদাতা মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক এমন সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্নকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হবে উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য কিছুসংখ্যক পরিপূরক প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক
- সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বহুবিধ পছন্দ সংবলিত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে রাখতে হবে
- প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ অতি সহজেই যাতে ছকবদ্ধ (tabulation) করা যায়, সে বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রশ্নমালার তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়াবলি

প্রশ্নের তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে :

- প্রশ্নের ক্রমপর্যায়করণ (chronological order)
- সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলি
- প্রশ্নের কাঠামো
- সহজবোধ্য ভাষা ও শব্দের ব্যবহার
- দ্ব্যর্থবোধকহীন
- প্রশ্নের আকার

- স্পষ্ট নির্দেশনা
- অগ্রবর্তি প্রশ্ন
- বিরক্তিকর প্রশ্ন এড়িয়ে চলা
- ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করা
- ঘটনাভিত্তিক প্রশ্ন করা
- অনুমিত প্রশ্ন না করা
- পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন করা

প্রশ্নমালার ব্যবহার

শিক্ষা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন গঠন করা হয় তাদের কাঠামোর বিভিন্নতা থকে। একজন গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশ্ন প্রণয়ন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। সুতরাং উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশ্নমালা তৈরি করতে গবেষককে যত্নবান হতে হয় এবং প্রশ্নমালা সেই অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

৫.২ সাক্ষাৎকার : ধরন ও ব্যবহার (Interview : Nature and Conduct)

সাধারণভাবে কোনো উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মুখোমুখি অবস্থানে মৌখিক আলাপকে সাক্ষাৎকার বলে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

- নির্বাচনমুলক সাক্ষাৎকার (Selection interview)
- নিদানমূলক সাক্ষাৎকার (Diagnostic interview)
- গবেষণা সাক্ষাৎকার (Research interview)

এখানে শুধু আমরা গবেষণা সাক্ষাৎকার নিয়েই আলোচনা করব। শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণার সাক্ষাৎকারের সাথে দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য সাক্ষাৎকারের বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক গবেষণার সাক্ষাৎকারের বেলায় তথ্য আদান-প্রদানের চেয়ে তথ্য সংগ্রহের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকে গবেষণার জন্য আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বলতে গবেষণা সংক্রান্ত বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত কথোপোকথনকেই বোঝানো হয়। এখানে সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- সাক্ষাৎকার প্রধানত মৌখিক কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার উপর নির্ভরশীল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব প্রশ্ন করা হয় এবং যে সব উত্তর দেওয়া হয় তার সবই প্রধানত মৌখিকভাবে হয়ে থাকে। তাই সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে বাচনিক পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়।

- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সামনাসামনিভাবে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারী উভয়েই সশরীরে একই স্থানে উপস্থিত থেকে আলাপ-আলোচনা করতে হয় এবং এসময়ে একে অপরের চেহারা দেখতে পান। যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির সাথে সাথে ভিডিও কনফারেন্স বা স্কাইপির মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সাক্ষাৎকারদান পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের সাহায্যেও আজকাল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর থেকেও বড় বিষয় এই যে, বর্তমানে ইন্টারনেটের (internet) মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী যে কেবল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রশ্নসমূহের উত্তরই দিয়ে থাকেন তা নয়, সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ব্যক্তিত্ব, প্রশ্নের ধরন, তাঁর আচার-আচরণ, সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর উত্তরের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, সাক্ষাৎকার একটি পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক অংশ।

  প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য হতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্খা, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এমন অনেক তথ্য আছে যা সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীকে তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সেক্ষেত্রে গবেষককে তথ্য সরবরাহকারীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজে বিশেষ জ্ঞান ও যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি খুব সাধারণ একটি ব্যাপার নয়। সাক্ষাৎকারের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল :

ক. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য
খ. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য
গ. সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু
ঘ. সাক্ষাৎকারের পরিবেশ

ক. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণাবলি

সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব এবং সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা প্রধানত নির্ভর করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। বস্তুত এই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা একদিনে অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দীর্ঘ দিনের গভীর জ্ঞান। কারণ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয় সম্পর্কে ও সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর যদি সেই সমাজের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার, আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা, পদ্ধতি ইত্যাদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সেই সাক্ষাৎকার থেকে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। বস্তুত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অনেকগুলো গুণ থাকা দরকার যা সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ সমস্ত গুণকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা চলে। যথা :

- ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি (Subjective qualities)
- বস্তুনিষ্ঠ গুণাবলি (Objective qualities)

ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি বলতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত গুণাবলি যেমন– ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব প্রত্যুৎপন্নমতিতা, সহজ সরল ব্যবহার, স্বাভাবিক আচার আচরণ ইত্যাদি বোঝায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রশ্ন করার কৌশল ও ধরন, বাচনভঙ্গি, অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ সাক্ষাৎকার থেকে ভালো ফলাফল লাভের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এসব গুণ ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাজের প্রতি স্বীয় মনোভাব ও আগ্রহ, পক্ষপাতহীনতা, বিষয়ের প্রতি স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি দারুণভাবে সাক্ষাৎকারের ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপযুর্ক্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি ছাড়াও কতকগুলো বস্তুনিষ্ঠ গুণাবলি থাকে যা সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, সামাজিক স্তর, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি তাঁর ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকারের উপর এহেন গুণাবলির প্রভাব তেমন আছে বলে মনে না হলেও বাস্তবে কিন্তু এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহিলাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একজন মহিলা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করলে যেমন ফল পাওয়া যাবে, একজন পুরুষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করলে তেমন ফল পাওয়া যাবে না।

আসলে সাক্ষাৎকার একটি কলা, একটি দক্ষ পদ্ধতি যা ক্রমাগত অনুশীলন ও সাধনার দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারদাতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সমন্বয় ঘটলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য অধিকতর পূর্ণাঙ্গ হয়।

খ. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর গুণাবলি

সাক্ষাৎকার একটি পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক আলাপ-আলোচনা। তাই সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরও যথেষ্ট ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিশেষ কিছু গুণ তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কোনো বিষয়ে মৌখিকভাবে আলাপ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা একটি বিশেষ গুণ। এ গুণের বলেই তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট এবং যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। শিশু এবং মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা অশিক্ষিত লোকেরা যা চিন্তা করে তার যথাযথ বহি:প্রকাশ ঘটাতে পারে না বিধায় তারা সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য অনুপযোগী হিসেবে বিবেচিত হন।

মানুষের মন সব থেকে জটিল উপাদানে গঠিত। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে এই উপাদানকে জয় করতে না পারলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নিকট থেকে প্রকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বের করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিশেষভাবে গুরুত্বপায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সব সময় একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী যদি স্বত:স্ফূর্তভাবে সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত হন, তবেই তাঁর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত হতে পারে, অন্যথায় নয়। সাক্ষাৎকার প্রদানের ব্যাপারে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে রাজি করালে তাঁর দেওয়া তথ্য নির্ভরযোগ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করেন তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- কেবল তাঁদের কাছ থেকেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা উচিত যাঁরা স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎকার প্রদানে ইচ্ছুক
- সাক্ষাৎকারের বিষয় ও বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে ভালোভাবে অবগত করাতে হবে
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর যে সময় ব্যয় হবে তার জন্য কিছু পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সুবিধামতো সময়ে ও সুবিধামতো স্থানে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়া দরকার।

গ. সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু

গবেষণা বা সাক্ষাৎকারের বিষয় সাক্ষাৎকারের ফলাফলের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণার এমন অনেক বিষয় আছে যার উপর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এক্ষেত্রে যতই সর্তকতা অবলম্বন করুন না কেন বস্তুনিষ্ঠ সত্যের কাছাকাছি যাওয়া তাঁর জন্য অনেক সময় কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তিগত আয় বা বেতন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য কেউই জানাতে চান না। অর্থ সংক্রান্ত তথ্যকে মানুষ গোপনীয় বিষয় বলে মনে করেন। আবার অনেক দেশের লোকেরা তাদের যৌনজীবন সম্পর্কে অন্যের সাথে আলাপ করতে চান না।

পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক দেশের মহিলারা মুখ খুলতে চায় না। তাই অনেক সময় এহেন ব্যক্তিগত বিষয়ে, বিশেষ করে আয় ব্যয়, যৌনজীবন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষাৎকরের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলের ব্যবহারিক মূল্য অনেক কম।

ঘ. সাক্ষাৎকারের পরিবেশ (Environment of the Interview)

অন্যান্য সব উপাদানের মতো সাক্ষাৎকার গ্রহণ বিষয়ে সাক্ষাৎকারের পরিবেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাক্ষাৎকারের পরিবেশের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। যথা:

- প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment),
- সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ (Social and psychological environment)।

সাক্ষাৎকারের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে যে স্থানে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয় তার পরিবেশকে বোঝায়। সাক্ষাৎকার কক্ষের অবস্থান ও অবস্থা, বসার ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফ্যান ও লাইটের ব্যবস্থা ইত্যাদি সাক্ষাৎকারের প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ও বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ বলে।

সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব অর্পিত হয় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপর এই দায়িত্ব সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কিভাবে পালন করবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের কক্ষটি আলোকময়, কোলাহলমুক্ত ও রুচিসম্মত হলে এবং বসার ব্যবস্থা ভালো থাকলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ অনানুষ্ঠানিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এর অর্থ এই যে, সাক্ষাৎকার যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অফিসে সংঘটিত হয় তাহলে তিনি অবশ্যই নিজ চেয়ার ছেড়ে সাধারণ চেয়ারে বসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। এর ফলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের মানসিক পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে।

সাক্ষাৎকারের ধরন (Types of Interview)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রক্রিয়াভেদে সাক্ষাৎকার দু'প্রকারের হতে পারে :

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Formal interview) এবং
২. অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Informal interview)।

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Formal interview)

এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পূর্বনির্ধারিত বিশেষ কতকগুলো প্রশ্নের (set of predetermined questions) উপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সামান্য নমনীয়তার সুযোগও প্রদান করা হয়। প্রয়োজনানুসারে তিনি সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, প্রশ্নের শব্দ পরিবর্তন করতে পারেন, এমন কি নতুন প্রশ্নও সংযোজন করার অধিকার রাখেন। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের সুবিধা হলো এই যে, এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা যায় এবং সব উত্তরদাতার কাছ থেকেই উত্তর সংগৃহীত হয়েছে কিনা তা সহজভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

২. অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Informal interview)।

এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পূর্বনির্ধারিত কোনো প্রশ্নের সাহায্য ছাড়াই গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে ঘরোয়াভাবে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালার সীমারেখায় আবদ্ধ না করার কারণে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রেও এখানে তুলনামূলকভাবে পূর্বনির্ধারিত কৌশলের ব্যবহার কম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাকে খোলাখুলিভাবে উত্তরদানের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। উত্তরদাতাগণ সামাজিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক সময় উক্ত ঘটনাবলিকে তাদের নিজেদের মতো করেও সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। তবে একথা সত্য যে, সামাজিক গবেষণায় আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারই বেশি ব্যবহৃত হয়।

অনুসূচি (Schedule)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় অনুসূচি। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলিও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অনুসূচির প্রশ্নগুলোকে পর্যায়ক্রমে উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং প্রশ্নকারী স্বয়ং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রশ্নপত্রের নির্দেশিত স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। অনুসূচি প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যে উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত সে সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো একটিও যাতে অনুসূচি হতে বাদ না পড়ে অনুসূচি প্রণয়নকারীকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (Interview Guide)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময় অনুসূচি (Schedule) ব্যবহৃত হয় না। অনুসূচির ব্যবহার দেখলে অনেক সময় উত্তরদাতাগণ প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তরদানের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন। অনুসূচির ব্যবহার ব্যতিরেকে শুধু পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে উত্তরদাতাগণ তুলনামূলকভাবে খোলামেলা আলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই অনুসূচি ছাড়াই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এমতাবস্থায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের সাহায্যে উত্তরদাতাগণকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এবং নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে 'সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা' সরবরাহ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সব তথ্যের প্রয়োজন তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সাক্ষাৎকার নির্দেশিকাতে প্রদান করা হয়। এই নির্দেশিকা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। প্রয়োজনবোধে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের ধরন, ভাষা ও শব্দ পরিবর্তন করতে পারেন।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Interview Method)

সুবিধা

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়:

- গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।
- উত্তরদাতা প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝে উত্তর দিচ্ছেন নাকি না বুঝেই উত্তর দিচ্ছেন সে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিশ্চিত হতে পারেন।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে প্রশ্নকারী তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন।
- সাক্ষাৎকারের পরিবেশের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- উত্তরদাতার ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখে একজন দক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অতি সহজেই অনুমান করতে পারেন উত্তরদাতা সঠিক উত্তর পরিবেশন করছেন কিনা।
- প্রশ্ন না বুঝলে প্রশ্নকারী বার বার তা বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।
- উত্তরদানের বিষয়ে উত্তরদাতাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করার সুযোগ পাওয়া যায়।

অসুবিধা

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ রয়েছে :

- গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন।
- মৌখিকভাবে পরিবেশিত উত্তরের যথার্থতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।
- সাক্ষাৎকার পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে গবেষণা করলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে বিভিন্ন রকমের ফল পাওয়া যায়।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংবেদনশীলতা, মেজাজ ও অন্যান্য মানসিক অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না, যা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করা হলে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ধরন, উত্তর লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদিতে তারতম্যের কারণে সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে।
- গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করা হলে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ধরন, উত্তর লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদিতে তারতম্যের কারণে সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে।
- সাক্ষাৎকার একটি বাচন পদ্ধতি বিধায় সব তথ্যই যথাসময়ে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয় না।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কিভাবে উন্নত করা সম্ভব

সাক্ষাৎকার সার্থকভাবে সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিক কাজ। অতি সতর্কভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পরও এতে প্রচুর ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। কাজেই এই পদ্ধতি উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই দ্বিধা ও সংকোচে ভোগেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী চিন্তা করেন কি করে তিনি অপরিচিত ব্যক্তির সামনে খোলামেলাভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। অপরদিকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীও চিন্তিত থাকেন কীভাবে তিনি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। সমগ্র সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সার্থক করতে হলে উভয়ের মধ্যকার দ্বিধা, সংকোচ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি কাটিয়ে উঠতে হবে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সাক্ষাৎকার দানকারীর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, পরিবেশিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করতে হবে এবং সরবরাহকৃত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল কী কাজে লাগবে তা বুঝিয়ে বলতে হবে। উভয়ের মধ্যে এহেন পরিবেশ ও সম্পর্ক সৃষ্টির উপর সঠিক তথ্য সংগ্রহের নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাক্ষাৎকার পরিচালনা সংক্রান্তকলাকৌশল আয়ত্তকরণের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাথে সহজে সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

৫.৩ : পর্যবেক্ষণ : ধারণা ও ব্যবহার (Observation : Concepts and Usages)

সাধারণত ধারাবাহিকভাবে দূর অথবা নিকট থেকে অবলোকন করাকে ‘পর্যবেক্ষণ’ বলা হয়। শিক্ষা ও সমাজ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ বলতে উপাত্ত সংগ্রহের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বুঝায়। এটি তথ্য সংগ্রহের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে গবেষক গবেষণার পরিবেশকে কখনো কোনোভাবে প্রভাবিত করেন না। অন্য কথায় বলা যায়, পর্যবেক্ষণ এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যাতে গবেষক গবেষণা পরিবেশের উপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে বা কোনো চলকের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল আচরণ বা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ গবেষক শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থাকে কোনো প্রকার বাধাগ্রস্ত না করেই তথ্য সংগ্রহ করেন। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল যেভাবে আচরণ করে তা হুবহু অবলোকন করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই সমাজ থেকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়।

বিচিত্র এই পৃথিবীর দিকে তাকালে পর্যবেক্ষণ করার মতো অনেক কিছুই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণভাবে চোখে দেখা এবং বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষকও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সামাজিক ঘটনাবলির মধ্য থেকে তাঁর গবেষণার জন্য প্রযোজ্য এমন কোনো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন তা নির্দিষ্টরূপে ঠিক করে উঠতে পারেন না। অথচ প্রকৃতির বা সমাজের বিভিন্ন বস্তু বা মানুষের মধ্য থেকে সঠিক বিষয়টি খুঁজে বের করা এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করাই পর্যবেক্ষকের আসল উদ্দেশ্য। পর্যবেক্ষণের কাজটি সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্য গবেষকের পর্যাপ্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দরকার হয়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরাসরিভাবে সংগৃহীত হয়। যেমন– যদি কোনো গবেষক গ্রামবাংলায় কিভাবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চান বা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচার-আচারণ সম্পর্কে সরাসরিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাহলে গবেষককে সশ্লিষ্ট সমাজে অবস্থান করে বিষয়সমূহের প্রতি পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। জনগোষ্ঠীর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সার্থকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে গবেষককে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে:

- গবেষককে প্রথমেই সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে যে, তিনি কোনো বিষয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবেন।
- এরপর তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কীভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।
- অতঃপর যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে।
- গবেষক ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হতে হবে এবং তা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে সে বিষয়েও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Observation)

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতি থেকে পৃথক করে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশের কোনোরূপ রদবদল করা হয় না।
- পরিবেশকে অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী দল, জনগোষ্ঠী, শ্রেণী বা দলের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় বিধায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণসংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা যায়।
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর আচরণসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয় না, যে পটভূমিতে আচরণ সংঘটিত হয় সেই পটভূমি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়।
- এই পদ্ধতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণকৃত জনগোষ্ঠীর আচরণকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে এমন বিষয়াদি সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তা পর্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট পটভূমি থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে :

- **নোট করা :** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেযখনই যে তথ্য পাওয়া যাবে তখনই সে সব তথ্য নোট করে ফেলতে হবে। কারণ যে কোনো মুহূর্তে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য পর্যবেক্ষণকারীর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে। তাই যখন যেখানে যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে তখনই তা লিখে রাখা সব থেকে উত্তম।
- **চিত্রগ্রহণ :** গবেষণা কর্মে গবেষককে বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা বা অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হয়। লিখিত বর্ণনার পাশাপাশি যদি ঘটনা যেখানে যে পরিবেশে বা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে তার চিত্র দেওয়া হয় তাহলে বর্ণনা আরো সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। চিত্রের মাধ্যমে মূল ঘটনা ছাড়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরা সম্ভব যা পাঠকের জন্য বিয়ষবস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভে বিশেষ সহায়ক হয়।
- **মানচিত্রের ব্যবহার :** গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যে এলাকায় বসবাস করে সে এলাকার একটি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুত করে গবেষণা কর্মের সাথে সংযোজন করলে বিষয়বস্তু আরো পরিস্ফুটিত হয়। আজকাল অনেক গবেষণা কর্মেই পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার মানচিত্র তৈরি করে সংযোজন করা হয় যা গবেষণার মানকে আরো উন্নত করে।
- **অনুসূচি প্রস্তুত :** যে কোনো পদ্ধতিতেই গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হোক না কেন তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক অনুসূচি সেই প্রক্রিয়াকে সহজ ও উন্নততর করে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনো কোনো বিষয়ে তথ্য সংগৃহিত হবে, কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, সংগৃহিত তথ্য কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে ইত্যাদি বিষয় সংবলিত পর্যবেক্ষণ অনুসূচি প্রণয়ন করলে অতি সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এহেন অনুসূচি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে পৃথক করে কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে পর্যবেক্ষককে পথ নির্দেশ করে।

পর্যবেক্ষণের প্রকারভেদ (Classification of Observation)

পর্যবেক্ষণকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়। এর একটি হলো নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত এবং অপরটি হলো পর্যবেক্ষকের ভূমিকাসংক্রান্ত। অনুসন্ধানের পটভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণকে আবার নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

- প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ (Naturalistic observation)
- নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Controlled observation)

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ (Naturalistic observation)

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণকারী প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে আচরণ যেভাবে সংঘটিত হয় ঠিক সেভাবেই পর্যবেক্ষণ করেন। পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গবেষক এক্ষেত্রে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন না। যেমন– কোনো গবেষক যদি হেলিকপ্টার থেকে বা অন্য কোনো উপায়ে দূর থেকে জঙ্গলের প্রাণিদের আচরণ প্রত্যক্ষ করেন তবে তাকে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ বলা হবে। কারণ এক্ষেত্রে তিনি জঙ্গলের পরিবেশ-পরিস্থিতির স্বাভাবিক গতির উপর কোনোই হস্তক্ষেপ করেন নি। অনুরূপভাবে যদি কোনো গবেষক কোনো শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকে সমুদ্রের মাছ বা জলজ প্রাণীদের পারস্পরিক আচার-আচারণের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন তবে সেটিও প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে পড়বে।

নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Controlled observation)

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া (Experimental procedure) অনুযায়ী পর্যবেক্ষণের কাজ সংঘটিত হলে তাকে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ বলে। অনেক সময় পর্যবেক্ষণকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাব থেকে পর্যবেক্ষণীয় আচরণকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এহেন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রয়োজনীয় ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। বর্তমানে শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপযোগ্য তথ্য (Mesurable data) সংগ্রহ সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কথা চিন্তা-ভাবনায় আনা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণের কাজে শব্দধারক যন্ত্র, গতিবিধি লিপিবদ্ধকরণ যন্ত্র, ক্যামেরা, পর্যবেক্ষণ অনুসূচি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জীব-জন্তুর পারস্পরিক আচরণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছুসংখ্যক জীব-জন্তুকে চিড়িয়াখানার নিয়ন্ত্রিত পরিসরে আনা হলো এবং একমুখী আয়না ব্যবহার করে তাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করা হলে যাতে গবেষকের উপস্থিতি তাদের আচরণের উপর কোনো প্রকার প্রভাব ফেলতে না পারে।
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণকে আবার নিম্নেলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

- অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant observation)
- অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ (Non-participant observation)

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant observation)

গবেষক যখন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত হন তখন তাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। এক্ষেত্রে গবেষক সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। উক্ত জনগোষ্ঠীর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে গবেষক প্রতিদিন কী ঘটছে, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ কেমন, আচার-আচরণের পরিবর্তন প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কড়া নজর রাখেন। অনেক সময় গবেষক তাদের সাথে ভালোভাবে মিশে যাওয়ার জন্য তাদের ভাষা ও কথোপকথনের রীতি আয়ত্ত করেন। পর্যবেক্ষকের কাজ হলো সংশ্লিষ্ট লোকের সাথে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে নেওয়া যাতে তিনি তাদের জীবন প্রণালি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ও পক্ষপাতহীন চিত্র তুলে ধরতে পারেন। তাই তাঁকে সেই সব গুণ আয়ত্ত করতে হয় যা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে সহায়তা করে। এসব গুণ অবশ্য জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও আকার, পর্যবেক্ষক জনগোষ্ঠীর কী দেখতে চান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। জনগোষ্ঠী যদি তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট হয় (একটি পরিবার) তবে তার মধ্যে বসবাস করা গেলেও পূর্ণ সদস্য হওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে গবেষকের স্বাতন্ত্র্য ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হয় এবং তিনি অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হতে পারেন। আর যদি জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকারের হয় তবে গবেষকের পক্ষে তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা অধিকতর সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি অতি সহজেই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন এবং নিজেকে উক্ত সমাজের একজন সদস্য হিসেবে ভাববার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা অনুভব করেন না। সমাজের অন্যান্য সদস্যও গবেষকের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। ফলে গবেষক স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ দু'ভাবে সংঘটিত হতে পারে:
১. গবেষক নিজেই কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন, অথবা
২. উক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য না হয়েও তিনি ঐ জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা না হওয়া নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গবেষক সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য হউন বা না হউন, তাকে উক্ত জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে হবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রক্রিয়ায় কোনো পূর্ব অনুমান প্রণয়ন করা হয় না। পর্যবেক্ষণকারীর কাজ হলো যা ঘটে তা প্রত্যক্ষ করা এবং সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করা।

অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ (Non-participant observation)

অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ হলো সেই পর্যবেক্ষণ যেখানে গবেষক জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না বরং জনগোষ্ঠীর সচরাচর কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলতে দিয়ে তা পর্যবেক্ষণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি গোষ্ঠীর কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং ধারাবাহিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করেন, অথচ কখনও তাদের সদস্যদের ন্যায় গোষ্ঠীকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না। এই পদ্ধতিতে সদস্যদের স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে গবেষককে কিছু দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করা প্রয়োজন যাতে তাঁর উপস্থিতিকে সব সদস্যই স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে গবেষককে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় যাতে তাঁর তথ্য সংগ্রহকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের বিষয়সমূহকে কেউ সন্দেহের চোখে না দেখে।

কোনো গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল লাভ করা যায়। গবেষণার বিষয় নির্বাচন ছাড়াও কোনো জনগোষ্ঠীর বাস্তব কর্মতৎপরতার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানার জন্য প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অতি উত্তম। কিন্তু এই পদ্ধতির একটা বড় রকমের অসুবিধা হলো এই যে, অনেক সময় এটা আচরণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। গোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন একজন লোকের পক্ষে আচরণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে গোষ্ঠীর সদস্যদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা সত্যিই কঠিন কাজ।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Observation Method)

- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ-সরল একটি পদ্ধতি। গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতির মতো জটিল প্রক্রিয়া এখানে অনুসরণ করা হয় না। গবেষক শুধু তাঁর চোখ দু'টোকে সম্বল করেই এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
- এই পদ্ধতিতে মানুষের আচার-আচরণ যেখানে যেভাবে প্রকাশ পায় ঠিক সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘটনা সংঘটনের পরিবেশের উপর সব ধরনের প্রভাব ব্যতিরেকে ঘটনার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় বিধায় এই পদ্ধতিতে অবিকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়।
- শিশু বা মানসিক প্রতিবন্ধী যারা নিজের বা সমাজ সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য প্রদান করতে পারে না, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায়।
- পৃথিবীতে এমন অনেক দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠী রয়েছে যারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। তারা কোনো গবেষককে তাদের সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করার অনুমতিও দেয় না। এমতাবস্থায় উক্ত সমাজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ একমাত্র পদ্ধতি।
- সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা সাক্ষাৎকার দানে রাজি হয় না বা সময়ের অভাবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে না, সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে উক্ত লোকদের কাছ থেকে অনায়াসেই তথ্য সংগৃহীত হয়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantage of Observation Method)

- এই পদ্ধতিতে গবেষককে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশকিছু দিন অবস্থান করতে হয় যা সব সময় গবেষকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।
- এই পদ্ধতিতে আর একটি বড় অসুবিধা হলো এই যে, কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষককে ঐ ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় থাকতে হয়। যেমন কোনো গবেষক যদি এই পদ্ধতিতে কোনো উপজাতির বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাহলে তাঁকে ঐ উপজাতির একটি বিবাহ অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক গবেষকেরও স্বীয় দর্শন, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদিতে ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে পর্যবেক্ষণের সময় সংগৃহীত তথ্যের উপর গবেষকের উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তথ্যকে পক্ষপাতদুষ্ট করে।
- গবেষক কোনো ঘটনা ততক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন যতক্ষণ ধরে উক্ত ঘটনাটি ঘটে। অর্থাৎ ঘটনার স্থায়িত্বের উপর পর্যবেক্ষণ নির্ভরশীল। একদিকে যেমন অতি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা দুরূহ, তেমন দীর্ঘদিন ধরে সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করাও বিরক্তিকর।
- একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে মতামত জরিপ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি কাজ সম্ভবপর হয় না।

৫.৪ : ফোকাস দল আলোচনা (FGD) : প্রয়োগ পদ্ধতি, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

(Focused Group Discussion : Application Method, Advatages and Limitations)

ফোকাস দল আলোচনা, ফোকাস দল আলোচনার বৈশিষ্ট্য, ফোকাস দল আলোচনা উপাদান, ফোকাস দল আলোচনা ধাপসমূহ ও ফোকাস দল আলোচনা সীমবদ্ধতা এর উপর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

ফোকাস দল আলোচনা

সমাজ ও শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে ইদানীং কয়েকটি পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে তন্মধ্যে ফোকাস দল আলোচনা একটি। সেবাগ্রহীতাদের আচরণ এবং মনোভাব জানার জন্য ৭০ এর দশকে প্রথম উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে এই ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, গ্রাম উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে আগে জরিপ, মূল্যায়ন ও নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল বিধায় এবং তাতে প্রকৃত কল্যাণপ্রত্যাশী জনগণের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে তার কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ ছিল না। এ ছাড়া ঐ সব পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য প্রচুর জনবল এবং অর্থের ও প্রয়োজন হয়।

এসব কারণে বর্তমানে ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শিক্ষা ও সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুণগত পদ্ধতি হিসেবে তা অন্যান্য পদ্ধতির সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতি যদিও অন্যান্য পদ্ধতির বিকল্প নয়, তবে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির সম্পূরক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফোকাস দলের সংজ্ঞা (Definition of FGD) :

বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে ফোকাস দল আলোচনার সংজ্ঞা প্রদান করেন। ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি এফজিডি পদ্ধতি নামেই পরিচিত। এটি মূলতঃ একটি দলীয় আলোচনা। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমধর্মী সদস্যদের মধ্য হতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি ক্ষুদ্র দলকে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার সুযোগ দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাকে ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি যেহেতু একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি সেজন্য এটি গবেষকদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে এরপরও অনেকে ফোকাস দল এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। Folch-Lyon and Trost মতে A focus group session can be simply defined as a discussion in which a small number (usally six to 12) of respondents, udner the guidence of a moderator, talk about topics that are believed to be special importance to the investigation” (1981:144). Gupta এর ভাষায় y...a qualitative research method with a definite goal is essentially a group discussion taking place between people of more or less identical age, socio-economic status, sex and other common characteristics” (1991:15).

ফোকাস দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of FGD Team)

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ফোকাস দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- ফোকাস দল আলোচনায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
- ৬-১২ জনের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে ফোকাস দল আলোচনা গঠিত হয়ে থাকে।
- সদস্যদের একজনের মধ্যস্থতায় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।
- ফোকাস দল আলোচনায় সমধর্মী এবং সকল শ্রেণীর, নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সকলের অংশগ্রহণ থাকে।
- এ পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকের মতামত সংগ্রহ করা হয়।
- বিভিন্ন ব্যক্তির মতামতের ওপর একে অন্যকে প্রশ্ন করেন, কোনো বিষয়ে সকলে তাদের মতামত দিয়ে থাকেন।
- গবেষক আলোচনার সময় উপস্থিত হয়ে তাদের দলের আলোচনাকে গভীরে নিয়ে যান।

ফোকাস দল আলোচনা উপাদান

একটি ফোকাস দল আলোচনায় বেশ কিছু উপাদান থাকে, যথা :

- একজন অনুসন্ধানকারী বা গবেষক
- সহায়তাকারী বা সঞ্চালক
- প্রতিবেদক ২ জন ও
- আলোচক বা অংশগ্রহণকারী

- ফোকাস দল আলোচনায় একজন অনুসন্ধানকারী বা গবেষক থাকেন যিনি আলোচনা পরিচালনায় সাহায্য করেন। প্রতিবেদক থাকেন ২ জন যারা প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, রেকর্ড করেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন। আর আলোচকের সংখ্যা ৬ থেকে ১২ জনের মধ্যে সীমিত থাকে। তবে ৮ জনের দলই একটি আদর্শ দল। এছাড়া আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয়, স্থান ঠিক করা হয় এবং আলোচনা পরিচালনার জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়।

- এ পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে ১৯৭৮ সালে ইউনিসেফ, ১৯৭৯ সালে মার্কিন জাতীয় হার্ট, লাং ও ব্লাড ইনস্টিটিউট। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচী, ১৯৯২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় অধীন আদর্শ গ্রাম প্রকল্প মূল্যায়ন, ১৯৯৩ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে ফোকাস দল আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ফোকাস দল আলোচনা ধাপসমূহ (Steps of FGD)

যে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়, তেমনি ফোকাস দল আলোচনার কতকগুলো ধাপ রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো :

১) লক্ষ্য নির্ধারণ

ফোকাস দল আলোচনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে হলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ এ আলোচনা থেকে কি অর্জন করতে চান তা পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এই লক্ষ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে যথা : যদি ফোকাস দল আলোচনাটি অন্য কোনো পদ্ধতির সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ উদ্দেশ্য একরকম হবে আর যদি এটি সম্পূর্ণ একক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটি ভিন্ন রকম হবে। সুতরাং ফোকাস দলের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে মূলত প্রধান গবেষক।

২) কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

ফোকাস দল আলোচনার জন্যসঞ্চালক হিসেবে যে সকল কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদের অবশ্যই এ কাজে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে বিশেষ করে দল ভিত্তিক আলোচনা পরিচালনা করা, দলীয় আচরণ, মনোভাব, সভায় বিভিন্ন সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়াও যাদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে তাদের এ ফোকাস দল আলোচনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সুতরাং ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনার জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩) নির্দেশাবলি (Guidelines) প্রণয়ন

ফোকাস দল আলোচনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী (Guidelines) আগেই প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না, কারণ এ নির্দেশাবলি ব্যতিরেকে আলোচনাকে সুচারুরূপে চালানো সম্ভব নয়। এ নির্দেশাবলীর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা মূল উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যহত করবে। সুতরাং আলোচনা যাতে ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে এবং সঞ্চালক যাতে গোটা আলোচনা অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন সে জন্য নির্দেশনাবলি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৪) দল গঠন

ফোকাস দল আলোচনার জন্য এ পর্যায়ে দল গঠনের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্যদল বা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি থেকে দল গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা যেন সমদলভুক্ত হয় এবং নমুনায়নের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। দলে যাদের অর্ন্তভূক্ত করা হবে তারা যদি পরস্পরের পরিচিত হন তাহলে অবশ্যই তা ফোকাস দল আলোচনার ক্ষেত্রে সুবিধাজনকই হবে। তবে তারা যদি পরস্পর পরিচিত হন তাহলে আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে, আর তারা যদি পূর্ব পরিচিত হন তাহলে অবশ্যই ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

৫) আলোচনার স্থান, সময় নির্ধারণ এবং আমন্ত্রণপত্র প্রস্তুতকরণ

ফোকাস দল আলোচনার জন্য স্থান এবং সময় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হয় যেমন স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে যথা : স্থানটি সকলের জন্য উপযোগী কিনা, পরিবেশ অনুকূল কিনা, সকলে সেখানে স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন কি না এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কিনা। অপরদিকে সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করতে হবে। তাদের যথাসময়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে হবে এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের ২/১ দিন আগে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এছাড়া যে সব ব্যক্তিরা দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগেই জেনে নেওয়া ভালো। অর্থাৎ ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত দিক সম্পর্কে প্রারম্ভে জেনে নেওয়া। এছাড়া ঐ কর্মসূচিভুক্ত এলাকা, সংশ্লিষ্ট জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে প্রারম্ভে জরিপের মাধ্যমে জেনে নেওয়া ভালো। আলোচনাকারীকে সেজন্য আলোচনার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলা হয়, তবে তাঁদের কাছে আলোচ্যবিষয় স্পষ্ট করে বলা হয় না।

৬) আলোচনা অধিবেশন পরিচালনা

নির্ধারিত দিন আলোচনাস্থলে প্রথমে সঞ্চালক সকলকে স্বাগত জানাবেন এবং পরিচয় পর্ব সমাপ্ত করবেন। এরপর আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দলকে অবহিত করবেন। আলোচনার প্রারম্ভে হালকা বিষয় দিয়ে শুরু করতে হয় এবং ক্রমে আলোচনার গভীরে যেতে হয়। তবে সব সময় সঞ্চালক খেয়াল রাখবেন যে, আলোচনা যেন মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে অন্যকিছুতে সরে না যায়। এদিকে প্রত্যেকে যেন আলোচনায় অংশ নেয় এবং তাদের মতামত প্রদান করে সেদিকেও সঞ্চালককে নজর রাখতে হয়। প্রতিবেদক এ সময় আলোচনার প্রতিটি বিষয় নোট করবেন এবং সম্ভব হলে অডিও টেপে ধারন করবেন। সঞ্চালক আলোচনাকে প্রাণবন্ত করার জন্য সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করবেন তবে তিনি অবশ্যই কোনো বিষয়ে মত দিবেন না। সকল সময়ে নজর রাখবেন যে, আলোচনাকারী দল অতি স্বচ্ছন্দে তাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে কিনা? আলোচনা যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। অধিবেশন শেষে সঞ্চালক আলোচনার একটি সার-সংক্ষেপ সকল সদস্যের সামনে তুলে ধরবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা চূড়ান্ত করবেন। এরপর ধন্যবাদ দিয়ে সঞ্চালক আলোচনা শেষ করবেন।

৭) তথ্য মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ

ফোকাস দলের আলোচনা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তার মূল্যায়ন করে সঞ্চালক তথ্যগুলিকে শ্রেণিবিভক্ত করবেন। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বক্তব্য বিচার বিশ্লেষণ করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করবেন। প্রাপ্ত তথ্যকে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে তুলনা করে তা গুণগতভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এরপর প্রধান অনুসন্ধানকারী তা প্রতিবেদন আকারে চূড়ান্ত রূপ দেন।

ফোকাস দলের আলোচনার সীমাবদ্ধতা

ফোকাস দলের ব্যবহার যদিও এনজিওগুলোতে খুব ব্যাপক, তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা হলো :

- এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল সব সময় বস্তুনিষ্ঠ হয় না অর্থাৎ তা ভাবনিষ্ঠ হয়।
- অতি ক্ষুদ্র নমুনা থেকে গৃহিত তথ্য সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।
- এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকল্প যাচাই করা যায় না।
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ সঞ্চালক খুব কমই পাওয়া যায়।

৫.৫ : ডকুমেন্ট : ধরন ও বিশ্লেষণে সর্তকতা

(Documents : Types and Precaution of Document Analysis)

গবেষণায় গবেষক বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তথ্য সংগ্রহের উৎস সাধারণত দুটো যথা : প্রাথমিক উৎস এবং মাধ্যমিক উৎস। প্রাথমিক উৎস থেকে গবেষক সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেন, আবার গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী উপাত্ত দ্বিতীয় পর্যায় থেকেও সংগ্রহ করেন। গবেষণার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে কোনো উৎস থেকে শতকরা কত ভাগ উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরউপর কোনো গবেষণা করতে হলে এখনও জীবিত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কোনো লেখকের গ্রন্থ থেকে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত গ্রন্থটি থেকে সংগৃহিত উপাত্ত ও তথ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের ডকুমেন্ট। তাই গবেষকগণ শিক্ষা, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় দ্বিতীয় পর্যায় বা মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের উৎস অর্থাৎ ডকুমেন্টসমূহ ব্যবহার করে থাকেন। একজন গবেষক তিনি যে সমস্যার উপর গবেষণা করেন তিনি সেই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স পুস্তক, গবেষণা দলিল, প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক দলিল, স্থাপনা ও পুরাকীর্তি ইত্যাদি থেকে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেন। সুতরাং একজন গবেষকের ডকুমেন্ট থেকে উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। ডকুমেন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষক একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

একজন গবেষককে তাঁর নির্দিষ্ট গবেষণাটিতে কোনো কোনো ধরনের ডকুমেন্ট ব্যবহার করবেন, তা পূর্বেই চুলচেরা বিশ্লষনের মাধ্যমে বাছাই করে নিতে হয় । যেমন, পত্রিকার সংবাদ ও ইন্টারনেটের ডকুমেন্ট কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে তা যাচাই বাছাই করে নিতে হয়। আর ব্যবহৃত ডকুমেন্ট যে উৎস থেকে ব্যবহার করছেন, তার রেফারেন্স অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, অন্যথায় তা চৌর্যবৃত্তির (plagiarism) বলে গণ্য হবে। এর কারণে গবেষকের গবেষণা কর্ম অথবা ডিগ্রি বাতিল করা হয় এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। একজন গবেষককে ডকুমেন্ট ব্যবহার ও বিশ্লেষণে অবশ্যই আন্তরিক ও সৎ হতে হয়।

অনুশীলনী

নমুনা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রশ্নমালা কী?
২. সাক্ষাৎকার কী?
৩. পর্যবেক্ষণ কী?
৪. এফজিডি কী?
৫. ডকুমেন্ট বিশ্লেষণের ৫টি উপায় উল্লেখ করুন।

নমুনা রচনামূলক প্রশ্ন

১. নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা কী? একটি শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা তৈরি করুন ।
২. সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করুন।
৩. বিভিন্ন প্রকারের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিন।
৪. পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
৫. বিভিন্ন শ্রেণির পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দিন।
৬. গবেষণায় এফজিডি কেন ব্যবহার করা হয়? এফজিডি ব্যহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

তথ্যসূত্র

- ড. খুরশিদ আলম (২০০৩), সমাজ গবেষণা পদ্ধতি (৫ম সংস্করণ), মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা
- রহমত আলী ছিদ্দিকী, সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- ড. মো আবু তাহের (২০০৮), সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (১ম সংস্করণ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা
- এম. হাসান আলী, মোঃ নাসির উদ্দিন, ড. মোঃ ফিরোজুল ইসলাম (২০১০), সামাজিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি (সমাজবিজ্ঞান) (৩য় প্রকাশ), অনু প্রকাশনী, ঢাকা
- জিনাত জামান (১৯৮৭), শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল (১ম প্রকাশ), শিল্পতরু, ঢাকা
- ড. ডি এম ফিরোজ শাহ (২০১৭), শিক্ষায় গবেষণা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা।
- Folch-Lyon and Trost, G.F. – yConducting Focus Group Session" Studies in Family Planing, Vol. 12, No. 2, Dec. 1981.
- Gupta, Achintya Das – The Qualitative Approach to Social Research, Dhaka, WorldviewInternational Foundation. 1989.
- Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). *Educational research: An introduction*. Longman Publishing.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (1993). *How to design and evaluate research in education* (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.
- Keppel, G. (1991). *Design and analysis: A researcher's handbook*. Prentice-Hall, Inc.
- Lipsey, M. W. (1990). *Design sensitivity: Statistical power for experimental research* (Vol. 19). Sage.
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches*. Sage.
- Neuman, W. L., & Robson, K. (2004). *Basics of social research*. Pearson.

ইউনিট-৬ : উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

যে কোনো গবেষণায় উপাত্ত বা তথ্যের যথাযথ বিবরণ, বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুধাবনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য সারণি, লেখচিত্র, রেখাচিত্র, আয়তলেখ, স্তম্ভলেখ, পাইচিত্র বা মানচিত্রের সাহায্যে তথ্য বা উপাত্ত উপস্থাপন করলেই গবেষণার কাজ শেষ হয় না। বরং সংগৃহীত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সাধারণীকরণ করা যায় এবং তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা যায়। একজন গবেষক গবেষণা কর্মের প্রথম থেকেই তথ্যের প্রকৃতি, ধরন, উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, অনুমান গঠন, পরীক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন। সংগৃহীত তথ্যগুলো ব্যবহার উপযোগী করাই হলো তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই ইউনিটে বর্ণনামূলক গবেষণার কিছু উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৬.১ : উপাত্তের ধারণা, গুরুত্ব, ধরন এবং বিশ্লেষণ কৌশল (Concepts of Data, Importance, Types and Tecniques of Analysis)

উপাত্তের ধারণা (Concepts of Data)

আমাদের এ মহাবিশ্বে তথা পৃথিবীতে প্রতিদিনই হাজার রকম ঘটনা ঘটছে। এ সব ঘটনার কোনোটি দেখা যায় আবার কোনোটি দেখা যায় না। কোনোটি বস্তুগত, কোনোটি অবস্তুগত বা সম্পর্কজাত। এ সব ঘটনা মানুষের পর্যবেক্ষণের আওতায় এলে, কোনো না কোনোভাবে তা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, তখন তাকে বলে তথ্য বা উপাত্ত। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষক তথ্যকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: কারো কারো মতে এ বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা, উপাদান, প্রাসঙ্গিক বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ হলো তথ্য। আমরা এটাও বলতে পারি যে, পরিসংখ্যানিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে তথ্য নির্ভর। উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্লাসের দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কে বেশি মেধাবী তা জানতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর বা স্কোর জানা আবশ্যক। এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর বা স্কোর হলো একটি উপাত্ত।

যে কোনো গবেষণার জন্য অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে কোনো বৈশিষ্ট্য গণনা করে যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়, তাকে সংখ্যাতত্ত্বের ভাষায় বলে উপাত্ত। উপাত্ত হতে পারে যে কোনো ঘটনা, সংখ্যা বা প্রাসঙ্গিক বস্তু। উপাত্তসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে যে অর্থপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় তা-ই তথ্য। তথ্য ও উপাত্ত গবেষণা বিশ্লেষণের ভিত্তি। নিম্নে উপাত্তের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

- কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, উচ্চতা, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদির তথ্য,
- কোন ব্যক্তির নিজের, পারিবারিক, আয়-ব্যয়, সঞ্চয়, অবস্থানগত ইত্যাদির তথ্য,
- কোন দেশের জনসংখ্যার বয়স, উচ্চতা, জন্ম, মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য,
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পর্কিত কোনো বিশেষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের কার্যকারিতা নির্ণয়ে সক্ষম দম্পতির মতামত সম্পর্কিত তথ্য,
- ক্রেতার বয়স, আয়, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য,
- কোনো নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে ভোটারদের মতামত সম্পর্কিত তথ্য,
  ভৌগোলিক জরিপে আবহাওয়া, ভূমি ব্যবহার, উৎপাদন, বৃষ্টিপাত, সার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য,
- পাহাড় ধস, ভূমি ধস, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা ইত্যাদিতে ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য।

উপাত্ত ও তথ্যের গুরুত্ব (Importance of Data and Information)

সংখ্যাতত্ত্বের যে কোনো শাখায় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম এবং ব্যাপক। সাধারণত কোনো ঘটনার বর্ণনা দ্বারা কোনো গবেষকই তার গবেষণা কাজ চালাতে পারে না। কারণ ঘটনার বর্ণনা দ্বারা তথ্যের বা উপাত্তের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এ জন্য প্রয়োজন হয় ঘটনার সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্তের। নিম্নে উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

- কোন ঘটনা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে,
- কোন ঘটনা ঘটার সংখ্যা জানার জন্য,

- তথ্য সংগ্রহ এবং তা সঠিক ব্যাখ্যার জন্য,
- কোন গবেষণাকে সংক্ষিপ্ত এবং সহজবোধ্য করার জন্য,
- কোন ঘটনা সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য,
- সারণি, চিত্র ইত্যাদি দ্বারা উপস্থাপনের জন্য,
- গবেষণা লব্ধ ফলাফল জনকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য,
- অন্যান্য গবেষকরা যাতে ফলাফল সম্পর্কে ভুল ধারণা না পায় সেজন্য,
- গবেষণা সম্পদ (Resources) এবং লব্ধ ফলাফল যাতে কেউ ধ্বংস বা নষ্ট করতে না পারে সেজন্য,
- গবেষণা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য ।

উপাত্তের ধরন বা প্রকারভেদ (Types of Data)

উৎস অনুসারে উপাত্তকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
(ক) প্রথম পর্যায়ের বা প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data)
(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক উপাত্ত (Secondary Data)

(ক) প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত (Primary Data)

কোনো গবেষণার জন্য যে তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বা প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত বলে। আবার মৌলিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল উৎস বা গবেষণা ক্ষেত্র হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হলেও তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বা প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত বলে। প্রথম পর্যায়ের উপাত্তে কোনো পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি ফলে তা বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। এটি সংগ্রহ বেশ ব্যয়বহুল, শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধুমাত্র বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এরূপ উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে।

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- পরোক্ষ মৌখিক অনুসন্ধান,
- সরাসরি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ,
- ডাকযোগে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান,
- টেলিফোনে সাক্ষাৎকার,
- স্থানীয় উৎস হতে অনুসন্ধান,
- অনুসন্ধানকারী নিয়োগ করে তালিকার মাধ্যমে অনুসন্ধান,
- ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত (Secondary Data)

যে উপাত্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশনা/ডকুমেন্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত বলে। প্রকৃতপক্ষে এ উপাত্ত পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- সরকারি উৎস
- আধা-সরকারি উৎস ও
- বেসরকারি উৎস।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য :

প্রাথমিক উপাত্ত	মাধ্যমিক উপাত্ত
১. প্রাথমিক উপাত্ত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়।	১. মাধ্যমিক উপাত্ত পরোক্ষভাবে সংগৃহীত হয়।
২. গবেষণার প্রয়োজনে প্রথমবারের মতো সংগ্রহ করা হয়।	২. মূল উৎস হতে সংগৃহীত উপাত্ত অন্য কোনো গবেষণার জন্য পুনরায় সংগ্রহ করা হয়।
৩. অধিক অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন।	৩. অপেক্ষাকৃত কম অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন।
৪. প্রাথমিক উপাত্ত অধিক নির্ভরযোগ্য।	৪. মাধ্যমিক উপাত্ত কম নির্ভরযোগ্য।
৫. প্রাথমিক উপাত্তে ঝুঁকি এবং ভুল ভ্রান্তি কম থাকে।	৫. অন্যের দ্বারা সংগৃহীত বলে মাধ্যমিক উপাত্তে ঝুঁকি এবং ভুল ভ্রান্তি নিরূপণ করা সহজ নয়।

উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল (Tecniques of Data Analysis) :

সকল পরিসংখ্যানিক অনুসন্ধানের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। আবার পরিসংখ্যানের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই জটিল। এ জটিল বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে ব্যবহার উপযোগী করে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গবেষকের সংগ্রহকৃত উপাত্তগুলোকে সুসংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহার উপযোগী করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে অগ্রসরমান হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো উপাত্ত বিশ্লেষণ। উপাত্ত বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাপ্ত উপাত্তের আলোকে গবেষণার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যে সমস্ত কৌশল বা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা তিন রকমের হতে পারে। যথা:

১. বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (Descriptive Analysis)
২. সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণ (InferentialAnalysis)
৩. কম্পিউটার বিশ্লেষণ (ComputerAnalysis)

১. বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (Descriptive Analysis)

যে বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্যাবলিকে ছকে উপস্থাপন করে শতকরা, কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিচ্যুতি, সহ-সম্বন্ধ, নির্ভরণ ইত্যাদির প্রয়োগ দেখানো হয় তাকে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ বলা হয়। গবেষক প্রথমে তার প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে একটি করে চলক বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ছকে সন্নিবেশ করেন। এটি হলো এক চলক বিশিষ্ট ছক। একটি ছকে একাধিক চলকের তথ্য উপস্থাপন করে কোনো সম্পর্ক দেখান হলে তখন তাকে বলে বহুচলক বিশিষ্ট ছক। বহুচলক বিশিষ্ট ছকে বিভিন্ন চলকের মধ্যাকার তুলনা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়।

২. সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণ (InferentialAnalysis)

এটি হচ্ছে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের চেয়ে উচ্চতর প্রক্রিয়া। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যখন কোনো পরিসংখ্যানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকৃত ফলাফলের সাথে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা পরিমাপ করা হয় তখন তাকে সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণ বলে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলি ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত কৌশল প্রয়োগ করা হয়:

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ
- বিস্তার পরিমাপ
- সম্পর্ক পরিমাপ
- বঙ্কিমতা ও সূঁচালতা পরিমাপ
- সূচক সংখ্যা বিশ্লেষণ
- কালিন সারি বিশ্লেষণ

৩. কম্পিউটার বিশ্লেষণ (ComputerAnalysis)

আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কম্পিউটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণায় কম্পিউটারের অবদান অতুলনীয়। এছাড়াও যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ জীবকোষের গঠন ও চারিত্রিক অবস্থাও কম্পিউটার বিশ্লেষণ করতে পারে। কম্পিউটার কল্পনাতিতভাবে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ যেমন-সটিং, কো-রিলেশন ইত্যাদির সহজ সমাধানের মাধ্যমে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি গবেষণার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে উপাত্তের সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ। কম্পিউটার ছাড়া এ কাজ চিন্তাও করা যায় না।

৬.২ : কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

৬.২.১ : কেন্দ্রীয় প্রবণতার ধারণা ও গড় নির্ণয়

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করলে সেগুলো এলোমেলো থাকে। এগুলোকে বলে অবিন্যস্ত স্কোর বা অবিন্যস্ত উপাত্ত। এই অবিন্যস্ত স্কোরকে মানের ক্রমানুসারে (ঊর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রম) সাজালে কেন্দ্রের দিকে এমন একটি স্কোর পাওয়া যায়, যেটির দিকে অন্যান্য স্কোরগুলো যেতে চায় বা যাওয়ার প্রবণতা দেখায়। স্কোরগুলোর কেন্দ্রের দিকে যেতে চাওয়ার এই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। আবার তথ্যমালাকে গণসংখ্যা টেবিলে সাজালে বা সারণিবদ্ধকরণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্কোর মাঝামাঝি শ্রেণিগুলোতে থাকে। যে কোনো বন্টনের স্কোরগুলোর মাঝামাঝি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। ধরা যাক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনার বি. এড. শ্রেণির ১ম সিমেস্টারের ক-শাখার ১১ জন শিক্ষার্থী ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে 15 নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষায় 10, 12, 9, 11, 10, 7, 13, 8, 11, 14 এবং 10 নম্বর পেয়েছে। প্রাপ্ত এই স্কোরগুলো এলোমেলো অবস্থায় আছে। এগুলোকে বলে অবিন্যস্ত স্কোর বা অবিন্যস্ত উপাত্ত। এগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে পাওয়া যায়

$$\underrightarrow{7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 10,}\ \textcircled{10}\ \underleftarrow{11,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14}$$

এখানে কেন্দ্রের মানটি 10 (বৃত্তেরমধ্যে)। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, কেন্দ্রীয় মান 10 এর দিকে, তার দু'দিকের মানগুলো যেতে চাওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। এই প্রবণতাই হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতা। স্কোরগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করলে বণ্টনটি হবে নিম্নরূপ :

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা
14 - 15	1 ↓
12 - 13	2 ↓
10 - 11	5 (কেন্দ্র)
8 - 9	2 ↑
6 - 7	1 ↑
মোট	11

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সারি 10–11 এর মধ্যে 5 জন শিক্ষার্থী নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী 10–11 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। এর উপরের দিকে 12-13 নম্বর পেয়েছে 2 জন শিক্ষার্থী এবং 14–15 নম্বর পেয়েছে মাত্র 1 জন শিক্ষার্থী। আবার নিচের দিকে 8–9 নম্বর পেয়েছে 2 জন শিক্ষার্থী এবং 6–7 নম্বর পেয়েছে মাত্র 1 জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ উপরের ও নিচের শ্রেণিগুলোতে গণসংখ্যা কম। মনে হচ্ছে দু'দিক থেকেই কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। কোনো বণ্টনের স্কোরগুলোর কেন্দ্র বা মাঝামাঝি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক (Measures of Central Tendency)

প্রাপ্ত তথ্যের কেন্দ্রীয় প্রবণতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক প্রয়োজন। এটি একটি সংখ্যামাত্রা। যা সম্পূর্ণ বণ্টনটির প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা যায়, তাকে বলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ থেকে সাধারণত দু'টি তথ্য পাওয়া যায়। যথা:

১. কোন দলের কৃতিত্বের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
২. দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে তুলনা।

শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা হয়। যথা:

(ক) গড় (Mean)
(খ) মধ্যমা বা মধ্যক (Median) এবং
(গ) প্রচুরক (Mode)

(ক) গড় (Mean)

কোনো কোনো গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের মানগুলোর যোগফলকে উপাত্তের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে গড় বলে। এটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্যতম পরিমাপক। এই গড়কে $\bar{x}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ : পাঁচ জন শিক্ষার্থীর বয়স যথাক্রমে 24, 28, 25, 30 ও 28। এই পাঁচ জন শিক্ষার্থীর বয়সের গড় নির্ণয় করুন।

সমাধান :

এখানে উপাত্ত রয়েছে মোট 5টি।

উপাত্তগুলোর যোগফল = 24 + 28 + 25 + 30 +28

= 135

শিক্ষার্থী পাঁচ জনের বয়সের গড় = $\frac{135}{5}$

= 27 বছর

সুতরাং নির্ণেয় গড় = 27 বছর

সূত্র দ্বারা গড় নির্ণয় :

১. অবিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয় :

সূত্রঃ অবিন্যস্ত রাশিমালার গড় = $\frac{\sum x}{N}$

এখানে, $\sum$ = যোগফল (Summation)

x = এক একটি স্কোর

$\sum x$ = স্কোরের সমষ্টি

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা

উদাহরণ : কোনো পরীক্ষায় 20 জন শিক্ষার্থী 50 নম্বরের মধ্যে 38, 45, 50, 42, 46, 35, 32, 38, 46, 42, 45, 44, 47, 48, 46, 45, 46, 38, 46, 46 নম্বর পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে গড় নির্ণয় করুন।

সমাধান : আমরা জানি, অবিন্যস্ত রাশিমালার গড় = $\frac{\sum x}{N}$

$\sum x$ = স্কোরের সমষ্টি

= 38 + 45 + 50 + 42 + 46 + 35 + 32 + 38 + 46 + 42 + 45 + 44 + 47 + 48 + 46 + 45 + 46 + 38 + 46 + 46

= 865

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা

= 20

অতএব, গড় = $\frac{865}{20}$

= 43.25

$\therefore$ নির্ণেয় গড় = 43.25

২. বিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয় :

(ক) দীর্ঘ পদ্ধতি :

সূত্রঃ গড় ($\bar{x}$) $= \dfrac{\sum fx}{N}$

এখানে, f = গণসংখ্যা

x = শ্রেণি মধ্যবিন্দু

N = মোট স্কোর সংখ্যা

উদাহরণ : দীর্ঘ পদ্ধতিতে প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের গড় নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
40–45	5
35–40	7
30–35	8
25–30	10
20–25	5
15–20	3
10–15	2
মোট	$N = 40$

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x)	fx
40–45	5	42.5	212.5
35–40	7	37.5	262.5
30–35	8	32.5	260.0
25–30	10	27.5	275.0
20–25	5	22.5	112.5
15–20	3	17.5	52.5
10–15	2	12.5	25.0
মোট	$N = 40$		$\sum fx = 1200$

আমরা জানি, গড় ($\bar{x}$) $= \dfrac{\sum fx}{N}$

এখানে, $\sum fx = 1200$

$N = 40$

অতএব, গড় ($\bar{x}$) $= \dfrac{1200}{40}$

$= 30$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় = 30

(খ) **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি :**

সূত্রঃ গড় ($\bar{x}$) $= \text{AM} + \left(\frac{\sum fd}{N}\right) \times i$

এখানে, AM = Assuming Mean বা আনুমানিক গড়

f = গণসংখ্যা

d = বিচ্যুতি

N = মোট স্কোর সংখ্যা

i = শ্রেণিব্যাপ্তি

উদাহরণ : সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের গড় নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	**গণসংখ্যা(f)**
40–45	5
35–40	7
30–35	8
25–30	10
20–25	5
15–20	3
10–15	2
মোট	$N = 40$

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	**গণসংখ্যা** f	**শ্রেণি মধ্যবিন্দু** **X**	**বিচ্যুতি** $d = \frac{x - AM}{C}$	fd
40–45	5	42.5	3	15
35–40	7	37.5	2	14
30–35	8	35.5	1	8
25–30	10	27.5=AM	0	0
20–25	5	22.5	–1	–5
15–20	3	17.5	–2	–6
10–15	2	12.5	–3	–6
মোট	$N = 40$			$\sum fd = 20$

আমরা জানি, গড় ($\bar{x}$) $= \text{AM} + \left(\frac{\sum fd}{N}\right) \times i$

এখানে, AM = 27.5

$\sum fd = 20$

$N = 40$

$i = 5$

অতএব, $\bar{x} = 27.5 + \frac{20}{40} \times 5$

$= 27.5 + 2.5$

$= 30.0$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় = 30

গড়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mean/Airithmatic Mean)

- কেন্দ্রীয় প্রবণতা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল পরিমাপ। কারণ মধ্যমা ও প্রচুরক থেকে গড়ের পার্থক্য কম হয়
- গবেষণায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মান থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়। গড় থেকে সহজেই তা নির্ণয় করা যায়
- একমাত্র গড়ের ক্ষেত্রেই বণ্টনের সব ক'টি স্কোরের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়ার কারণে গড় বিচ্যুতি এবং তার বর্গের উপর নির্ভর করা চলে
- পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতির মান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ
- গাণিতিক গড় থেকে সংখ্যাগুলোর ব্যবধানের সমষ্টি সব সময় শূন্য।

গড়ের ব্যবহার (Uses of Mean)

- সর্বোৎকৃষ্ট, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য
- একটি বণ্টনের বিভিন্ন পরিমাপ জানার জন্য
- আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমতি ব্যবধান, গড় বিচ্যুতি, বঙ্কিমতা, পরিঘাত, সূঁচালতা, সহ-সম্বন্ধ, নির্ভরণ ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য
- প্রতিটি স্কোরের গুরুত্ব সমান বলে মনে হলে সেক্ষেত্রে গড় ব্যবহার করতে হয়।

৬.২.২ : মধ্যমা বা মধ্যক (Median)

কেন্দ্রীয় প্রবণতার দ্বিতীয় পরিমাপক মধ্যমা। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাপক। মধ্যমা এমন একটি বিন্দু যা বণ্টনকে সমান দুইভাগে ভাগ করে। অর্থাৎ মধ্যমার উপরে বা নিচে সমান সংখ্যক রাশি বা স্কোর থাকে। মধ্যমা বিন্দুর নিচে ৫০% এবং উপরে ৫০% স্কোর থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, কোনো তথ্য সারিকে মানের ঊর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রমে সাজালে যে সংখ্যাটি ঠিক মধ্যবিন্দুতে থাকে, তাকে মধ্যমা বা মধ্যক বলে। বণ্টনের মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্কোরের আকার কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। সাধারণত মধ্যক মান দ্বারা বণ্টনের কোনো বিশেষ আবস্থান জানা যায়। সুতরাং প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যাকে মধ্যক বলা যায়।

উদাহরণ : বাংলা 50 নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষায় সাত জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে 34, 38, 45, 30, 36, 42 ও 44। মধ্যক মানটি নির্ণয় করুন।

সমাধান :

এখানে উপাত্ত রয়েছে মোট 7টি।

উপাত্তগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাওয়া যায় = 30, 34, 36, 38, 42, 44, 45।

সাতটি সংখ্যার মধ্যক হবে যে কোনো দিক থেকে চতুর্থ সংখ্যাটি। অর্থাৎ 38

গাণিতিকভাবে, মধ্যক = $\frac{N+1}{2}$ তম পদ (N = বেজোড় সংখ্যা হলে)

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদ

= 4তম পদ

= 38

সুতরাং নির্ণেয় মধ্যক বা মধ্যমা = 38

N = জোড় সংখ্যা হলে মধ্যমা হবে $\frac{N}{2}$ এবং $(\frac{N}{2}+1)$ পদের গড়।

সূত্র দ্বারা বিন্যস্ত রাশিমালার মধ্যমা নির্ণয় :

সূত্র: বিন্যস্ত রাশিমালার মধ্যমা = $L_1 + \dfrac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$

এখানে, $\frac{N}{2}$ = মধ্যমা শ্রেণি

L_1 = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার নিম্নসীমা

fm = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার গণসংখ্যা

f_c = মধ্যমা শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

i = শ্রেণিব্যাপ্তি

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা

সমস্যা-১ : প্রদত্ত বণ্টন থেকে মধ্যমা নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
79–82	1
75–78	3
71–74	3
67–70	5
63–66	7
59–62	13
55–58	8
51–54	6
47–50	5
43–46	4
39–42	1
মোট	$N = 56$

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা (fc)
79–82	1	56
75–78	3	55
71–74	3	52
67–70	5	49
63–66	7	44
L_1=59–62	13= fm	37
55–58	8	24 = f_c
51–54	6	16
47–50	5	10
43–46	4	5
39–42	1	1
মোট	$N = 56$	

→ মধ্যমা শ্রেণি

আমরা জানি, মধ্যমা = $L_1 + \dfrac{\frac{N}{2} - f_c}{fm} \times i$

এখানে, $\dfrac{N}{2}$ = মধ্যমা শ্রেণি = $\dfrac{N}{2} = \dfrac{25}{2} = 28$

L_1 = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার নিম্নসীমা = 59

fm = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার গণসংখ্যা = 13

f_c = মধ্যমা শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 24

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 5

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা্া = 56

সুতরাং মধ্যমা = $L_1 + \dfrac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$

$= 59 + \dfrac{28-24}{13} \times 5$

$= 59 + \dfrac{4}{13} \times 5$

$= 59 + 1.538$

$= 60.538 = 60.54$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা = 60.54

সমস্যা-২ : প্রদত্ত বণ্টন থেকে মধ্যমা নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
85–95	14
75–85	25
65–75	39
55–65	29
45–55	28
35–45	15

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা (fc)
85–95	14	150
75–85	25	136
L_1= 65–75	39= fm	111 → মধ্যমা শ্রেণি
55–65	29	72= fc
45–55	28	43
35–45	15	15
	N = 150	

আমরা জানি, মধ্যমা = $L_1 + \dfrac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$

এখানে, $\frac{N}{2}$ = মধ্যমা শ্রেণি = $\frac{N}{2} = \frac{150}{2} = 75$

L_1 = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার নিম্নসীমা = 65

fm = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার গণসংখ্যা = 39

fc = মধ্যমা শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 72

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 10

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা = 150

সুতরাং মধ্যমা = $L_1 + \dfrac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$

$= 65 + \dfrac{75-72}{39} \times 10$

$= 65 + \dfrac{3}{39} \times 10$

$= 65 + 0.769$

$= 65.769 = 65.77$

সুতরাং নির্ণেয় মধ্যমা = 65.77

মধ্যমার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Median)

- পর্যাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে প্রান্তীয় স্কোরটি চরম প্রকৃতির হলে গড়ের চেয়ে মধ্যমাই সঠিক পরিমাপ দেয়।
- প্রান্তীয় স্কোরগুলো অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হলে একমাত্র মধ্যমাই নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ।

মধ্যমার ব্যবহার (Application of Median)

- সহজে ও স্বল্প সময়ে হিসেব করার কাজে মধ্যক পরিমাপ করা হয়
- একটি চলককে সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য মধ্যমা ব্যবহার করা হয়
- সরাসরি সংখ্যাত্মক পরিমাপ করা না গেলে সেক্ষেত্রে মধ্যমার ব্যবহার বেশি হয়
- গুণবাচক উপাত্তের ক্ষেত্রে মধ্যমার ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ
- মুক্ত শ্রেণি বা অসম শ্রেণি বিশিষ্ট চলকের ক্ষেত্রে মধ্যমার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী
- বঙ্কিম নিবেশনের ক্ষেত্রে মধ্যমা ব্যবহার করা যায়
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মধ্যমার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে
- মজুরির হার নির্ণয়ে মধ্যমাকে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হয়
- অসম শ্রেণিব্যাপ্তি সম্বলিত চলকের ক্ষেত্রে মধ্যমার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী
- কোন বণ্টনের ঠিক মধ্যবিন্দু জানার প্রয়োজন হলেও মধ্যক ব্যবহৃত হয়।

৬.২.৩ : প্রচুরক (Mode)

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত অবিন্যস্ত স্কোর বা উপাত্ত লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনো একটি সংখ্যা অধিক বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এটিই প্রচুরক। সুতরাং কোনো তথ্য সারিতে যে মানটি সব চেয়ে বেশি বার পরিলক্ষিত হয় তাকে ঐ তথ্য সারির প্রচুরক বলে। আবার অবিন্যস্ত স্কোর বা তথ্যমালাকে গণসংখ্যা টেবিলে সাজালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্কোর মাঝামাঝি কোনো একটি শ্রেণিতে অবস্থান করে। তখন বুঝতে হবে যে, ঐ শ্রেণিতেই প্রচুরক রয়েছে। প্রচুরক হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের তৃতীয় পরিমাপক।

ধরি, বি.এড. শ্রেণির শিখন ও শিখন যাচাই বিষয়ে 15 নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষায় 20 জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর হলো 11,10, 13, 7, 9, 10, 10, 6, 11, 12, 10, 11, 10, 8, 14, 10, 13, 9, 13, 14। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, 10 নম্বর পেয়েছে সর্বাধিক 6 জন শিক্ষার্থী। সুতরাং এই অবিন্যস্ত বণ্টনের প্রচুরক হবে 10। উল্লেখিত তথ্যগুলোকে সারণিবদ্ধ করে নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা
14 – 15	2
12 – 13	4
10 – 11	9
8 – 9	3
6 – 7	2
মোট	20

প্রচুরক শ্রেণি

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সারি 10-11 এর মধ্যে 9 জন শিক্ষার্থী নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী 10-11 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। সুতরাং প্রচুরকের অবস্থান 10-11 শ্রেণিতে।

প্রচুরক (Mode) নির্ণয়ের সূত্র

সূত্র-১ : প্রচুরক (M_o) $= = L_1 + \dfrac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times i$

এখানে, L_1 =প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা

f_m = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির পরবর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা

i = শ্রেণিব্যাপ্তি

উদাহরণ : নিম্নে প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের প্রচুরক নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
80–85	5
75–80	8
70–75	9
65–70	15
60–65	7
55–60	4
50–55	2
মোট	$N = 50$

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
80–85	5
75–80	8
70–75	9= f_2
L_1=65–70	15= f_m
60–65	7= f_1
55–60	4
50–55	2
মোট	N = 50

প্রচুরক শ্রেণি

65-70 শ্রেণিতেগণসংখ্যা সর্বাধিক (15) হওয়ায় এটি প্রচুরক শ্রেণি।

আমরা জানি, প্রচুরক (M_o) = $L_1 + \dfrac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times i$

এখানে, L_1 =প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা = 65

f_m = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা = 15

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা = 7

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির পরবর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা = 9

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 5

$\therefore$ প্রচুরক (M_o) = $L_1 + \dfrac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times i$

$$= 65 + \frac{15-7}{2\times15-7-9} \times 5$$

$$= 65 + \frac{8}{14} \times 5$$

= 65 + 2.857

= 67.857

= 67.86

$\therefore$ নির্ণেয় প্রচুরক = 67.86

সূত্র-২: প্রচুরক = ৩× মধ্যমা − ২×গড়

উদাহরণ-১ : প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনের প্রচুরক নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
40–45	5
35–40	7
30–35	8
25–30	10
20–25	5
15–20	3
10–15	2
মোট	N = 40

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা f	শ্রেণি মধ্যবিন্দু x	বিচ্যুতি $d=\frac{x-AM}{C}$	fd	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
40–45	5	42.5	3	15	40
35–40	7	37.5	2	14	35
30–35	8	35.5	1	8	28
মধ্যমা শ্রেণি → 25–30	10	27.5=AM	0	0	20
20–25	5	22.5	–1	–5	10= fc
15–20	3	17.5	–2	–6	5
10–15	2	12.5	–3	–6	2
মোট	N = 40			$\sum fd$ =20	16

আমরা জানি,

গড় $(\bar{x})$ $=\text{AM}+\left(\frac{\sum fd}{N}\right)\times i$

এখানে, AM = 27.5

$\sum fd$ =20

N = 40

i =5

$\therefore \bar{x} = 27.5 + \frac{20}{40}\times 5$

$= 27.5 + 2.5$

$= 30.0$

আবার, মধ্যমা = $\text{L}_1+\frac{\frac{N}{2}-f_c}{f_m}\times i$

এখানে, $\frac{N}{2}$ = মধ্যমা শ্রেণি = $\frac{N}{2}=\frac{40}{2}$ = 20 [$\because N$ = মোট স্কোর সংখ্যা = 40]

L_1 = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার নিম্নসীমা = 25

f_m = যে শ্রেণিতে মধ্যমা রয়েছে তার গণসংখ্যা = 10

f_c = মধ্যমা শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 10

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 5

$$\therefore \text{ মধ্যমা} = L_1 + \frac{\frac{N}{2} - f_c}{f_m} \times i$$

$$= 25 + \frac{20-10}{10} \times 5$$

$$= 25 + \frac{10}{10} \times 5$$

$$= 25 + 5$$

$$= 30$$

∴ মধ্যমা = 30

এখন, আমরা জানি, প্রচুরক = 3×মধ্যমা – 2×গড়

= 3×30 – 2×30

= 90 – 60

= 30

∴ নির্ণেয় প্রচুরক = 30

উদাহরণ-২ : নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
79–82	1
75–78	3
71–74	3
67–70	5
63–66	7= f_2
L_1 = 59–62	13= f_m
55–58	8= f_1
51–54	6
47–50	5
43–46	4
39–42	1
মোট	N = 56

প্রচুরক শ্রেণি

সমাধান :

আমরা জানি, প্রচুরক (M_o) = $L_1 + \dfrac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times i$

এখানে, 59-62 শ্রেণিতেগণসংখ্যা সর্বাধিক (13) হওয়ায় এটি প্রচুরক শ্রেণি।

$\therefore L_1$ =প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা = 59

f_m = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা = 13

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা = 8

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির পরবর্তি শ্রেণির গণসংখ্যা = 7

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 4

$\therefore$ প্রচুরক (M_o) = $L_1 + \dfrac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times i$

$= 59 + \dfrac{13-8}{2\times13-8-7} \times 4$

$= 59 + \dfrac{5}{11} \times 4$

= 59+ 1.818

= 60.818

= 60.82

$\therefore$ নির্ণেয় প্রচুরক = 60.82

প্রচুরকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mode)

- প্রচুরকের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য
- প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তথ্যগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয় না
- রাশিমালার একটি মাত্র মানের ওপর গুরুত দেওয়া হয়
- প্রচুরক প্রান্তিক মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না
- গাণিতিক তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রচুরকের কোনো গুরুত্ব নেই
- রাশিমালার সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায়
- সর্বোচ্চ গণসংখ্যা দু'টি শ্রেণিতে থাকলে তখন দু'টি প্রচুরক হতে পারে

প্রচুরকের ব্যবহার (Uses of Mode)

- যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ খুব দ্রুত জানার প্রয়োজন হয়,
- কেন্দ্রীয় প্রবণতা মোটামুটিভাবে পরিমাপের জন্য,
- রাশিমালায় কোনো স্কোরটি বেশি আছে তা জানার জন্য,
- গুণগত দিক জানার জন্য,
- কোনো প্রবণতা প্রকাশের জন্য,
- ভৌগোলিক যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য (যেমন– আবহাওয়া সম্পর্কিত),
- কোন উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা নিতে প্রচুরকের সাহায্য নিতে হয়।

৬.৩ : বিস্তার পরিমাপ (Measures of Dispersion)

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ দ্বারা কোনো বন্টনের একটি সামগ্রীক ধারণা পাওয়া যায়। আবার তথ্যসারির তথ্যগুলো কেন্দ্রীয় প্রবণতার কাছাকাছি হলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপটি প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তথ্যসারির তথ্যগুলো কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপটি সমগ্র বন্টনের প্রতিনিধিত্ব করে না।

যে কোনো তথ্যমালার প্রধান ধর্ম হলো পরিবর্তনশীলতা। আর এ ধর্মের জন্য তথ্যসারির বিভিন্ন মানসমূহের কেন্দ্রের দিকে ঝোঁকার প্রবণতাও সমান হয় না। ফলে একটি তথ্যসারির কেন্দ্রীয় মানের দুপাশে তথ্যগুলো ছড়িয়ে থাকে। সাধারণত একটি তথ্যসারির তথ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে তথ্যসারির প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংখ্যা নির্ণয় করে থাকি। এক্ষেত্রে তথ্যসারির প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ যথেষ্ট নয়। তাই তথ্যসারির অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতা ছাড়াও অন্য পরিমাপ দ্বারা তথ্যসারির বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। কারণ কোনো চলকের প্রধান ধর্ম হলো পরিবর্তনশীলতা। আর এ ধর্মের জন্য অধিকাংশ সময়ে চলকের কেন্দ্রীয় ঝোঁক সমান হয় না। ফলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ দ্বারা তথ্যসারি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেওয়া সম্ভব হয় না। যে কোনো তথ্যমালার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তথ্যগুলো সমজাতীয় হলেও প্রত্যেকটি সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন মানের। মানের ভিন্নতার জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপগুলো তথ্যমালার অধিকাংশ অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। আবার দুটি তথ্যসারির কেন্দ্রীয় মান এক হলেও প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয় বিস্তার (Dispersion) ও বিস্তার পরিমাপের (Measures of Dispersion)। যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে, যেমন– তথ্য সারি বিশ্লেষণ, তথ্যগুলোর পার্থক্য বা ভিন্নতা নির্ণয় ইত্যাদি পরিমাপের জন্য বিস্তার পরিমাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৬.৩.১ : বিস্তার পরিমাপের ধারণা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকারভেদ (Concept, Importance and Types of Measures of Dispersion)

বিস্তার পরিমাপের ধারণা

কোনো তথ্যমালার তথ্যগুলো কেন্দ্রীয় মানের দুদিকে কিভাবে এবং কতদূর ছড়িয়ে থাকবে, তা তথ্যমালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তথ্যমালার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বিস্তার (Dispersion)। আর যে গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তথ্যমালার এই বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা যায় তাকে বলা হয় বিস্তার পরিমাপ (Measures of Dispersion)।
কোন বণ্টনের মধ্যক মান থেকে অন্যান্য স্কোরগুলোর ব্যবধান এবং বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য যে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়, তাকে বিস্তার পরিমাপ বলে।

বিস্তার পরিমাপ হলো কোনো বণ্টনের তথ্যগুলোর কেন্দ্রীয় মান থেকে পার্থ্যক্যের পরিমাপ। আবার যে সংখ্যাগত পরিমাপের সাহায্যে কোনো তথ্যমালার মানসমূহ তাদের কেন্দ্রীয় মান বা গড়ের চারদিকে কিভাবে বিস্তৃত হয় তার পরিমাপকে বিস্তার পরিমাপ বলে। কোনো চলকের গড় ঐ চলকের যথাযথ প্রতিনিধিত্বশীল কিনা বিস্তার পরিমাপ দ্বারা তা বোঝা যায়। দুটি তথ্যসারির কেন্দ্রীয় মান এক হলেও তাদের প্রকৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করলে এটি স্পষ্ট হবে। তাসনীম ও তাহসীনের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ:

নাম	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বিজ্ঞান	ধর্ম
তাসনীম (x)	80	85	90	88	82
তাহসীন (y)	98	98	99	65	65

এখানে, তাসনীমের প্রাপ্ত মোট নম্বর $=\sum X = 425$

এবং তাসনীমের প্রাপ্ত নম্বরের গড় = $\frac{\sum x}{N} = \frac{425}{5} = 85$

আবার, তাহসীনের প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি $= 425$

তাহসীনের প্রাপ্ত নম্বরের গড় = $\frac{\sum y}{N} = \frac{425}{5} = 85$

আপাত দৃষ্টিতে তাসনীম ও তাহসীনের গড় নম্বর সমান হলেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাহসীনের চেয়ে তাসনীমের ফলাফল ভালো। কেননা তাহসীনের তিনটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর প্রায় 100 হলেও তাসনীমের প্রাপ্ত নম্বর অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। গড় নম্বর একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর 65 থেকে 98 পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই স্কোরগুচ্ছের বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পাশাপাশি ঐ স্কোরগুলোর অবস্থান কেন্দ্রীয় মান থেকে কতটা বিস্তৃত তা জানার বা পরিমাপেরও প্রয়োজন হয়।

বিস্তার পরিমাপের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

বিস্তার পরিমাপের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি। যথা : (১) চলকের গড়ের চারদিকে তথ্যগুলোর অবস্থান কিরূপ তা নির্ণয় করা এবং (২) চলকের বিভিন্ন তথ্যের অবস্থানের তুলনা করা। নিম্নে বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে কেবলমাত্র তথ্যের মধ্যক মান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তথ্যের উপাদানসমূহের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায় না। বিস্তারের সাহায্যে তথ্যের এরূপ ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়।
- একই মধ্যক মান বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক নিবেশনকে তুলনা করতে বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজন রয়েছে।
- তথ্যের পরিসর বা বিস্তৃতি নির্ণয়ের জন্য বিস্তার পরিমাপ সবচেয়ে ভালো।
- গড়ের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করতে বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজন রয়েছে।
- একটি চলকের সাথে আর একটি চলকের তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিস্তার পরিমাপ সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।
- উপাদানসমূহের ঘনত্ব বেশি হলে বিস্তার পরিমাপ তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে উপযোগী।
- যে সব তথ্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে গড়, মধ্যমা এবং প্রচুরক ব্যর্থ সে সব ক্ষেত্রে বিস্তার পরিমাপ যথেষ্ট উপযুক্ত।
- সামাজিক, ভৌগোলিক ও শিক্ষা গবেষণায় সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের পরিমাপের জন্য বিস্তার পরিমাপের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিস্তার পরিমাপের প্রকারভেদ

বিস্তার পরিমাপকে প্রথমত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. অনপেক্ষ বা পরম পরিমাপ (Absolute Measure)
২. আপেক্ষিক পরিমাপ (Relative Measure)

১. অনপেক্ষ বা পরম পরিমাপ (Absolute Measure):

অনপেক্ষ বা পরম পরিমাপ আবার পাঁচ প্রকার। যথা:

১) পরিসর (Range)
২) গড় বিচ্যুতি বা গড় ব্যবধান (MeanDeviation)
৩) পরিমিত বা আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)
৪) ভেদাঙ্ক (Variance)
৫) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation)

২. আপেক্ষিক পরিমাপ (Relative Measure)

আপেক্ষিক পরিমাপকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১) পরিসরাঙ্ক (Co-efficient of Range)
২) গড় ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of MeanDeviation)
৩) ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Variance)
৪) চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Quartile Deviation)

৬.৩.২ : আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)

বিস্তার পরিমাপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপ হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান। কোনো বন্টনের গড় থেকে বিচ্যুতিগুলোর বর্গের সমষ্টিকে মোট বণ্টন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায়, তার বর্গমূলকে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান বলে। অন্য কথায়-"Standard Deviation is the square root of variance." অর্থাৎ ভেদাঙ্কের বর্গমূলকে আদর্শ বিচ্যুতি বলে। আদর্শ বিচ্যুতি সাধারণত σ (সিগমা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কেউ আদর্শ বিচ্যুতিকে ইংরেজি Standard Deviation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ SD দ্বারাও প্রকাশ করেন। সংজ্ঞা অনুসারে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান :

$\sigma = \sqrt{Variance}$, যেখানে variance $= i^2 \times \left\{ \frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N} \right)^2 \right\}$ বা, $\left\{ \frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N} \right)^2 \right\}$

সুতরাং আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N} \right)^2}$ (সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি)

বা, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N} \right)^2}$ (দীর্ঘ পদ্ধতি)

আদর্শ বিচ্যুতির ফলাফলের ব্যাখ্যা

আদর্শ বিচ্যুতির ফলাফলের ব্যাখ্যা করার জন্য স্বাভাবিক বণ্টনের কথা বিবেচনায় আনতে হবে। স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রসহ বিশদ বর্ণনা ৬.৪.৪ এ করা হয়েছে। এখানে শুধু ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মানগুলো উল্লেখ করা হলো।

গড় ± ১σ (M ± 1σ) অর্থাৎ (গড় - ১σ) থেকে (গড় + ১σ) এর মধ্যে শতকরা ৬৮.২৬ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় ± ২σ (M ± 2σ) অর্থাৎ (গড় - ২σ) থেকে (গড় + ২σ) এর মধ্যে শতকরা ৯৫.৪৪ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় ± ৩σ (M ± 3σ) অর্থাৎ (গড় - ৩σ) থেকে (গড় + ৩σ) এর মধ্যে শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় ± ১σ কে স্বাভাবিক পারদর্শিতার স্তর হিসেবে ধরা হয়।

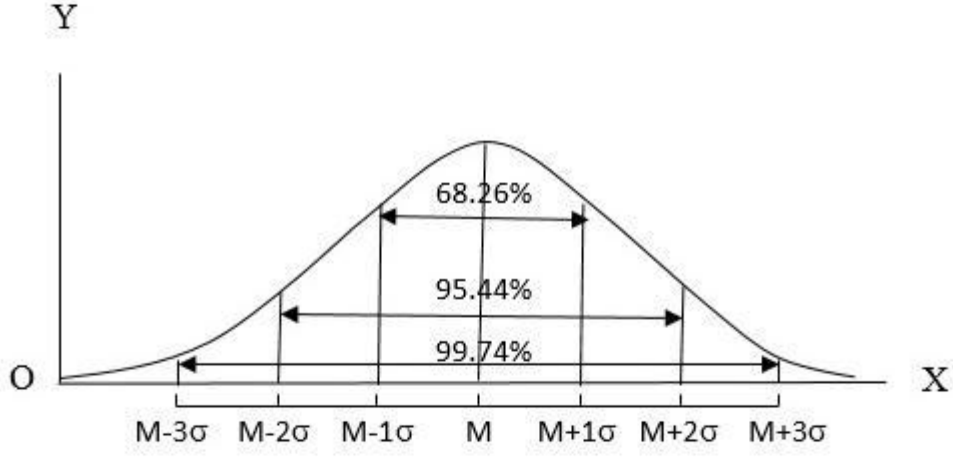

চিত্র: স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়

গড় বের করার সময় আমরা পাঁচ কলামের যে ছক তৈরি করেছিলাম, আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য সেই ছকেই চলবে তবে, fd এর ডান পাশে fd^2 শিরোনামে নতুন আর একটি কলাম অর্থাৎ ছয় কলামের প্রয়োজন হবে। fd কলামকে d কলামের সাথে গুণ করে fd^2 কলাম পাওয়া যাবে। এবার আমরা নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি।

উদাহরণ-১ : কোনো পরীক্ষায় নবম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের বণ্টন দেওয়া হলো। বণ্টনটি থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	**গণসংখ্যা**
65–69	1
60–64	3
55–59	8
50–54	9
45–49	12
40–44	7
35–39	5
30–34	3
25–29	2
	N=50

সমাধান :

আমরা জানি, আদর্শ বিচ্যুতি $(\sigma) = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা (f)	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x)	বিচ্যুতি $d = \frac{x-AM}{i}$	গণসংখ্যা× বিচ্যুতি (fd)	fd^2
65–69	1	67	4	4	16
60–64	3	62	3	9	27
55–59	8	57	2	16	32
50–54	9	52	1	9	9
45–49	12	47=AM	0	0	0
40–44	7	42	–1	–7	7
35–39	5	37	–2	–10	20
30–34	3	32	–3	–9	27
25–29	2	27	–4	–8	32
	N=50			$\sum fd$ =4	$\sum fd^2$ =170

সারণি থেকে পাই, $\sum fd^2 = 170$

$\sum' fd = 4$

$N = 50$

$i = 5$

$$\therefore \text{ আদর্শ বিচ্যুতি } (\sigma) = i\sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$$

$$= 5 \times \sqrt{\frac{170}{50} - \left(\frac{4}{50}\right)^2}$$

$$= 5 \times \sqrt{3.4 - 0.0064}$$

$$= 5 \times \sqrt{3.3936}$$

$$= 5 \times 1.8421$$

$$= 9.2105$$

$$= 9.21$$

$$\therefore \text{ আদর্শ বিচ্যুতি } (\sigma) = 9.21$$

ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য গড় নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমরা জানি, গড় (M) = AM + $\left(\frac{\sum' fd}{N}\right) \times i$

এখানে, AM = 47

$\sum' fd = 4$

N = 50

$i = 5$

$$\therefore \bar{x} = 47 + \frac{4}{50} \times 5$$

$$= 47 + 0.5$$

$$= 47.5$$

$\therefore$ গড় = 47.5

ফলাফলের ব্যাখ্যা

গড় 47.4এবং আদর্শ বিচুতি 9.21। এ তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, বণ্টনের শতকরা 68.26 ভাগ শিক্ষার্থী 47.4–9.21 বা 38.19 থেকে 47.4 + 9.21 বা 56.61 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। একই নিয়মে শতকরা 95.44 ভাগ শিক্ষার্থী 47.4–2 × 9.21 বা 28.98 থেকে 47.0 + 2 × 9.21 বা 65.82 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এবং শতকরা 99.74 ভাগ শিক্ষার্থী 47.4–3 × 9.21 বা 19.77 থেকে 47.4 + 3 × 9.21 বা 75.03 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গণিতে পারদর্শী।

উদাহরণ-২: নিম্নবর্ণিত গণসংখ্যা বন্টন থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	36–40	31–35	26–30	21–25	16–20	11–15
গণসংখ্যা (f)	2	2	3	8	3	2

সমাধান :

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা (f)	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x)	fx	fx^2
36–40	2	38	76	2888
31–35	2	33	66	2178
26–30	3	28	84	2352
21–25	8	23	184	4232
16–20	3	18	54	972
11–15	2	13	26	338
	N = 20		$\sum fx = 490$	$\sum fx^2 = 12960$

আমরা জানি, আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = $\sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2}$

সারণি থেকে পাই, $\sum fx^2 = 12960$

$\sum fx = 490$

$N = 20$

$i = 5$

সূত্রে মান বসিয়ে,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{12960}{20} - \left(\frac{490}{20}\right)^2}$$

$$= \sqrt{648 - 600.25}$$

$$= \sqrt{47.75}$$

$$= 6.910$$

$$= 6.91$$

$\therefore$ আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = 6.91

আমরা জানি, গড় ($\bar{x}$) = $\frac{\sum fx}{N}$

এখানে, $\sum fx = 490$

$N = 20$

$\therefore$ গড় (M) = $\frac{490}{20}$

= 24.5

$\therefore$ গড় (M) = 24.5

ফলাফলের ব্যাখ্যা

গড় ২৪.৫এবং আদর্শ বিচুতি ৬.৯১। এ তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, বণ্টনের শতকরা ৬৮.২৬ ভাগ শিক্ষার্থী ২৪.৫–৬.৯১ বা ১৭.৫৯ থেকে ২৪.৫ + ৬.৯১ বা ৩১.৪১-এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। একই নিয়মে শতকরা ৯৫.৪৪ ভাগ শিক্ষার্থী ২৪.৫–২×৬.৯১ বা ১০.৬৮ থেকে ২৪.৫ + ২×৬.৯১ বা ৩৮.৩২ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এবং শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ শিক্ষার্থী ২৪.৫–৩×৬.৯১ বা ৩.৭৭ থেকে ২৪.৫ + ৩×৬.৯১ বা ৪৫.২৩ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পারদর্শী।

উদাহরণ-৩ : নিম্নের বণ্টন থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা (f)	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x)	বিচ্যুতি $d=\frac{x-AM}{i}$	গণসংখ্যা× বিচ্যুতি (fd)	fd^2
36–40	2	38	3	6	18
31–35	2	33	2	4	8
26–30	3	28	1	3	3
21–25	8	23=AM	0	0	0
16–20	3	18	–1	–3	3
11–15	2	13	–2	–4	8
	N = 20			$\sum fd=6$	$\sum fd^2=40$

সমাধান : আমরা জানি, আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = $i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}-\left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

এখন সারণি থেকে পাই, $\sum fd^2 = 40$

$\sum fd = 6$

$N = 20$

$i = 5$

∴ আদর্শ বিচ্যুতি (σ) $= i\sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}-\left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

$= 5\times\sqrt{\frac{40}{20}-\left(\frac{6}{20}\right)^2}$

$= 5\times\sqrt{2.0-0.09}$

$= 5\times\sqrt{1.91}$

$= 5\times 1.3820$

$= 6.910$

$= 6.91$

∴ আদর্শ বিচ্যুতি (σ) $= 6.91$

আবার, আমরা জানি, গড় (M) = AM + $\left(\frac{\sum fd}{N}\right)\times i$

এখানে, AM = 23

$\sum fd = 6$

N = 20

$i = 5$

$\therefore \bar{x} = 23 + \frac{6}{20} \times 5$

=23 +1.5

= 24.5

$\therefore$ গড় = 24.5

ফলাফলের ব্যাখ্যা

গড় 24.5এবং আদর্শ বিচ্যুতি 6.91। এ তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, বণ্টনের শতকরা 68.26 ভাগ শিক্ষার্থী 24.5–6.91 বা 17.59 থেকে 24.5 + 6.91 বা 31.41 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। একই নিয়মে শতকরা 95.44 ভাগ শিক্ষার্থী 24.5–2 × 6.91 বা 10.68 থেকে 24.5 + 2 × 6.91 বা 38.32 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এবং শতকরা 99.74 ভাগ শিক্ষার্থী 24.5–3 × 6.91 বা 3.77 থেকে 24.5 + 3 × 6.91 বা 45.23 এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পারদর্শী।

আদর্শ বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য

- নিবেশনের প্রত্যেকটি স্কোরের উপর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিবেশনের কোনো একটি মান পরিবর্তন করলে আদর্শ বিচ্যুতির মানও পরিবর্তিত হবে।
- কোন নিবেশনে চরম প্রকৃতির স্কোর থাকলে আদর্শ বিচ্যুতি বেড়ে যাবে।
- নিবেশনে খুব বড় অথবা খুব ছোট কোনো স্কোর থাকলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।
- আদর্শ বিচ্যুতি গড় ব্যবধানের চেয়ে বড় হয়।
- দুটি সংখ্যার আদর্শ বিচ্যুতি সর্বদা গড় ও পরিসরের চেয়ে ছোট হয়।
- আদর্শ বিচ্যুতি নমুনার তারতম্য দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার

- আঞ্চলিক পর্যালোচনায় দুই বা ততোধিক বিষয়ের পার্থক্যের মান ও মাত্রা জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- শিল্প কারকাখানায় তথ্য বিশ্লেষণে এবং উৎকর্ষতা যাচাইয়ে আদর্শ বিচ্যুতির প্রয়োজন রয়েছে।
- প্রতিযোগিতামূলক দলগত খেলায় ভালোমন্দ বিশ্লেষণে, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা এবং ফলাফলের পূর্বাভাসের জন্য আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার রয়েছে।
- বিষমতার নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপের জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- নমুনা বিচার বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও সম্ভাবনার স্বাভাবিক লেখচিত্র বিশ্লেষণে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।
- কৃষি ক্ষেত্রে জমির পরিমাণের সাথে উৎপাদন, বৃষ্টিপাতের সাথে উৎপাদন, সার প্রয়োগ, কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার, ফসল আবর্তন, ভূমি আবর্তন ইত্যাদির সাথে উৎপাদনের পার্থক্য জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।
- স্থানিক বিশ্লেষণে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- বণ্টনের স্কোর গুচ্ছের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার রয়েছে।

৬.৩.৩ : চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation)

বিস্তার পরিমাপের একটি অনপেক্ষ বা পরম পরিমাপক (Absolute Measure)। গুরুত্বের বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত একটি পরিমাপক। বিস্তারের চতুর্থক দুটি। যথা: (১) প্রথম চতুর্থক এবং (২) তৃতীয় চতুর্থক। প্রথম চতুর্থক ও তৃতীয় চতুর্থকের বিয়োগফলের অর্ধেককে বলা হয় চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা চতুর্থাংশ ব্যবধান। সহজ কথায়, কোনো তথ্যসারির প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থকের পার্থক্যের অর্ধেককে বলে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি। চতুর্থাংশ বিচ্যুতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Quartile Deviation। সংক্ষেপে QD দ্বারা প্রকাশ করা হয়। QD বলতে বণ্টনটির ৭৫তম শতাংশ এবং ২৫তম শতাংশের অন্তবর্তী দূরত্বের ঠিক মধ্যবিন্দুকে বোঝায়। প্রথম চতুর্থককে Q_1 এবং তৃতীয় চতুর্থককে Q_3 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে বিন্দুর নিচে 25% এবং উপরে 75% স্কোর থাকে, তাকে প্রথম চতুর্থাংশ বিন্দু বা Q_1 বলে। আর যে বিন্দুর নিচে 75% এবং উপরে 25% স্কোর থাকে, তাকে তৃতীয় চতুর্থাংশ বিন্দু বা Q_3 বলে। সুতরাং বিন্যস্ত রাশিমালার চতুর্থাংশ বিচ্যুতির সূত্র হবে নিম্নরূপ :

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি $QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

যেখানে, $Q_1 = L_1 + \frac{\frac{N}{4} - F_{Q1}}{f_{m1}} \times i$

এবং $Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$

এখানে, $\frac{N}{4}$ = প্রথম চতুর্থক বা Q_1 শ্রেণি

L_1 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_1 রয়েছে তার নিম্নসীমা

f_{m1} = যে শ্রেণিতে Q_1 রয়েছে তার গণসংখ্যা

F_{Q1} = Q_1 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

i = শ্রেণিব্যাপ্তি

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা

এবং $\frac{3N}{4}$ = তৃতীয় চতুর্থক বা Q_3 শ্রেণি

L_3 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_3 রয়েছে তার নিম্নসীমা

f_{m3} = যে শ্রেণিতে Q_3 রয়েছে তার গণসংখ্যা

F_{Q3} = Q_3 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

উদাহরণ-১ : প্রদত্ত বণ্টন থেকে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
55–59	1
50–54	1
45–49	3
40–44	4
35–39	6
30–34	7
25–29	10
20–24	8
15–19	6
10–14	2
	N = 48

সমাধান:

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	
55–59	1	48	
50–54	1	47	
45–49	3	46	
40–44	4	43	
L_3=35–39	$6= f_{m3}$	39	Q_3 শ্রেণি
30–34	7	$33 = F_{Q3}$	
25–29	10	26	
L_1 = 20–24	$8 = f_{m1}$	16	Q_1 শ্রেণি
15–19	6	$8 = F_{Q1}$	
10–14	2	2	
মোট	N = 48		

আমরা জানি, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি QD = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

যেখানে, $Q_1 = L_1 + \frac{\frac{N}{4} - F_{Q1}}{f_{m1}} \times i$

এবং $Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$

এখানে, $\frac{N}{4}$ = প্রথম চতুর্থক বাQ_1 শ্রেণি= $\frac{48}{4}$ =12

L_1 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_1 রয়েছে তার নিম্নসীমা = 20

f_{m1} = যে শ্রেণিতে Q_1রয়েছে তার গণসংখ্যা = 8

F_{Q1} = Q_1 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 8

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 5

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা্যা = 48

সুতরাং $Q_1 = L_1 + \frac{\frac{N}{4} - F_{Q1}}{f_{m1}} \times i$

$= 20 + \frac{12 - 8}{8} \times 5$

$= 20 + \frac{4}{8} \times 5$

= 20 + 2.5

= 22.5

আবার, $Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$

এখানে, $\frac{3N}{4}$ = তৃতীয় চতুর্থক বা Q_3 শ্রেণি = $\frac{3 \times 48}{4}$ = 36

L_3 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_3 রয়েছে তার নিম্নসীমা = 35

f_{m3} = যে শ্রেণিতে Q_3 রয়েছে তার গণসংখ্যা = 6

F_{Q3} = Q_3 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 33

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 5

$$\therefore \quad Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$$

$$= 35 + \frac{36-33}{6} \times 5$$

$$= 35 + \frac{3}{6} \times 5$$

$$= 35 + 2.5$$

$$= 37.5$$

$\therefore$ চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (QD) $= \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

$$= \frac{37.5 - 22.5}{2}$$

$$= \frac{15}{2}$$

$$= 7.5$$

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (QD) = 7.5

উদাহরণ-২: নিচে প্রদত্ত বণ্টন থেকে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)
90–100	2
80–90	6
70–80	7
60–70	10
50–60	15
40–50	12
30–40	8
20–30	3
10–20	1
	N = 64

সমাধান :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	
90–100	2	64	
80–90	5	62	
70–80	7	57	
L_3=60–70	10= f_{m3}	50	⇐ Q_3 শ্রেণি
50–60	15	40= F_{Q3}	
L_1=40–50	13= f_{m1}	25	⇐ Q_1 শ্রেণি
30–40	8	12= F_{Q1}	
20–30	3	4	
10–20	1	1	
	N = 64		

আমরা জানি, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি QD = $\dfrac{Q_3 - Q_1}{2}$

যেখানে, $Q_1 = L_1 + \dfrac{\frac{N}{4} - F_{Q1}}{f_{m1}} \times i$

এখানে, $\dfrac{N}{4}$ = প্রথম চতুর্থক (Q_1) শ্রেণি= $\dfrac{64}{4}$ =16

L_1 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_1 রয়েছে তার নিম্নসীমা = 40

f_{m1} = যে শ্রেণিতে Q_1 রয়েছে তার গণসংখ্যা = 13

F_{Q1} = Q_1 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 12

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 10

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা = 64

সুতরাং $Q_1 = L_1 + \dfrac{\frac{N}{4} - F_{Q1}}{f_{m1}} \times i$

$= 40 + \dfrac{16 - 12}{13} \times 10$

$= 40 + \dfrac{4}{13} \times 10$

$= 40 + 3.076$
$= 43.08$

এবং $$Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$$

এখানে, $\frac{3N}{4}$ = তৃতীয় চতুর্থক (Q_3) শ্রেণি = $\frac{3\times 64}{4} = 48$

L_3 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_3 রয়েছে তার নিম্নসীমা = 60

f_{m3} = যে শ্রেণিতে Q_3 রয়েছে তার গণসংখ্যা = 10

F_{Q3} = Q_3 শ্রেণির পূর্ববর্তি শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা = 40

i = শ্রেণিব্যাপ্তি = 10

$$\therefore \quad Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3N}{4} - F_{Q3}}{f_{m3}} \times i$$

$$= 60 + \frac{48-40}{10} \times 10$$

$$= 60 + \frac{8}{10} \times 10$$

$= 60 + 8$
$= 68$

$\therefore$ চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (QD) $= \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

$$= \frac{68 - 43.08}{2}$$

$$= \frac{24.92}{2}$$

$= 12.46$

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (QD) = 12.46

চতুর্থাংশ বিচ্যুতির ব্যবহার

- যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার শুধুমাত্র একটি পরিমাপক মধ্যক জানা থাকে।
- কোন বণ্টনের নিচের বা উপরের দিক অসমাপ্ত বা অজ্ঞাত থাকলে।
- ছড়ানো স্কোরের সংখ্যা খুব বেশি থাকলে।
- বণ্টনটিতে প্রতিসাম্য বা স্কুনেশ বেশি পরিমাণ থাকলে।
- যখন কোনো বণ্টনের ঠিক মধ্যবর্তী 50% স্কোরের দুপ্রান্তের স্কোর দুটি জানার প্রয়োজন হয়।

৬.৪ : সহ-সম্পর্ক (Co-rrelation)

৬.৪.১ : সহ-সম্পর্কের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (Concept and classification of co-rrelation)

ইতোমধ্যে কোনো একটি তথ্য সারির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি এবং ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কি না সে সম্বন্ধে যাচাই করতে হয়। যেমন– গণিত বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার সাথে বাংলা বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার বা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার সাথে ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নির্ণয়ের প্রয়োজন পড়ে। সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ আমাদের এরূপ দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে থাকে।

'সহ-সম্পর্ক'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Co-rrelation. Co-rrelation শব্দটির আভিধানিক অর্থ পারস্পরিক সম্পর্ক (Mutual relationship)। অর্থাৎ দুটি চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। সহ-সম্পর্কের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেন ইংরেজ চিন্তাবিদ স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন। শিক্ষায় পরিসংখ্যানিক অনুসন্ধানে যেসব ক্ষেত্রে দুটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে সহ-সম্পর্ক নামক পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ দ্বারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চলকের একটি পরিবর্তনের সাথে অপরটি কতটুকু পরিবর্তন হয় তার মাত্রা নির্ণয় করা যায়।

L. R. Connor-এর মতে, "কোন একটি সমগ্রকের দুই বা ততোধিক চলক যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, একটির পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যটিরও পরিবর্তন হয়, তবে চলক দুটি পরস্পর সহ-সম্পর্কযুক্ত"।
W. I. King-এর মতে, "দুটি তথ্যসারি বা চলকের মধ্যে কার্যকারণযুক্ত সম্পর্ককে বলে সহ-সম্পর্ক"।
A. L. Boddington-এর মতে, "দুটি তথ্যসারির একটির পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরটিতে সমমুখী বা বিপরীতমুখী পরিবর্তন দেখা দিলেও সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলা যাবে না, যদি তথ্যসমূহের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক না থাকে"।
পরিসংখ্যানবিদ গিলফোর্ড-এর মতে, "যখন দুটি সারির ঘটনার মধ্যে পরিমাণগত বা গুণগত সম্বন্ধ থাকে, তখন সেই সম্বন্ধ নিরূপণ, পরিমাপ এবং সঠিকভাবে প্রকাশ করার উপযুক্ত সূত্র হলো সহ-সম্পর্ক"।

অতএব বলা যায়, একটি চলকের মানের পরিবর্তনের সংগে সংগে অপর চলকের মধ্যে যদি মানের পরিবর্তন দেখা যায়, তবে চলকদ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে সহ-সম্পর্ক বলে। সুতরাং সহ-সম্পর্ক হলো দুই বা ততোধিক তথ্যসারির মধ্যে সহগমনের প্রবণতা। দুই বা ততোধিক তথ্যসারির মধ্যে যদি একই দিকে বা বিপরীত দিকে সহগমনের অভাব দেখা দেয়, তা হলে এদের মধ্যে কোনো সহ-সম্পর্ক নেই বলে ধরে নেওয়া হয়। সহ-সম্পর্কের রয়েছে বিভিন্ন নাম। যথা : সহ-সম্বন্ধ, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ, সহসংস্রব, অনুবন্ধ, সহগতি আর এই সহ-সম্পর্কের মাত্রাকে বলে– সহ-সম্পর্ক সহগ, সম্বন্ধ অংক, সম্বন্ধ সহগ, সংশ্লেষাঙ্ক, বিশ্লেষাঙ্ক, সহসংস্রবাঙ্ক, অনুবন্ধ সহগ, সহগাঙ্ক, সহগতির সহগাঙ্ক, সহ-সম্পর্কের সহগাঙ্ক, সম্পর্ক মিতি (Co-efficient of Correlation)। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি চলকের পরিবর্তনের প্রকৃতি ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মাত্রাকে সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা সম্বন্ধ অংক বা সংশ্লেষাঙ্ক বা সহগাঙ্ক (Co-efficient of Correlation) বলে। একে r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সহ-সম্পর্কের প্রকারভেদ

দুটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান সহ-সম্পর্ককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. পূর্ণ ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক
২. আংশিক ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক
৩. পূর্ণ ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক
৪. আংশিক ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক
৫. শূন্য সহ-সম্পর্ক

১. পূর্ণ ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক

যখন দুটি চলকের একটির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি অপর চলকটিও সেই একই অনুপাতে বা সমান হারে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় তখন চলকদ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তাকে পূর্ণ ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বলে। এক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মাত্রা হয় 1, অর্থাৎ $r=1$। বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলো বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী একটি সরলরেখায় অবস্থান করবে। আনুভূমিক রেখায় x চলকের মান এবং উল্লম্ব রেখায় y চলকের মান নির্ধারণ করে x ও y চলকের প্রতি জোড়া মানকে ছক কাগজে বসালে প্রাপ্ত বিন্দুগুলোর সাধারণ একটি গতি বা দিক লক্ষ করা যায়। এই বিন্দুগুলোর মধ্য দিয়ে একটি রেখা op টানলে তা যে গতি নির্দেশ করে সেখান থেকে সহ-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এই op রেখায় x এর মান বাড়লে y এর মান বাড়বে আবার x এর মান কমলে y এর মান কমবে। এই বাড়া বা কমার হার সমান হলে পূর্ণ ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক নির্দেশ করে (১নং চিত্র)।

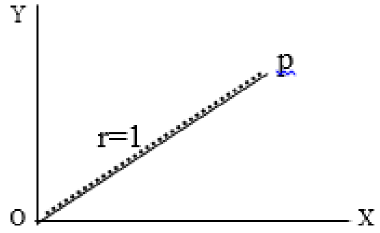

১ নং চিত্র

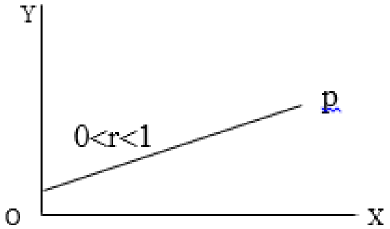

২ নং চিত্র

২. আংশিক ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক

যখন দুটি চলকের একটির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি অপর চলকটিরও হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং তা সুনির্দিষ্ট অনুপাতে বা সমান হারে না হয় তখন চলকদ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তাকে আংশিক ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বলে। op রেখায় x এর মান বাড়লে y এর মান বাড়বে আবার x এর মান কমলে y এর মান কমবে। এই বাড়া বা কমার হার সমান না হলে আংশিক ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক নির্দেশ করে (২নং চিত্র)। এক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মাত্রা 0 থেকে 1 এর মধ্যে অবস্থান করে। অর্থাৎ $0<r<1$।

৩. পূর্ণ ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক

যখন দুটি চলকের একটির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি অপর চলকটিও সেই একই অনুপাতে বা সমান হারে বিপরীত মুখী পরিবর্তন হয়, যেমন– প্রথম চলকটি যে হারে বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় চলকটি সেই একই হারে হ্রাস পায় আবার প্রথম চলকটি যে হারে হ্রাস পায় দ্বিতীয় চলকটি সেই একই হারে বৃদ্ধি পায় তখন চলকদ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তাকে পূর্ণ ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক বলে। pq রেখায় x এর মান যত বাড়ে y এর মান তত কমে আবার x এর মান যত কমবে y এর মান তত বাড়বে। এই বাড়া বা কমার হার সমান হলে পূর্ণ ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক নির্দেশ করে (৩নং চিত্র)। এক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মাত্রা হয় -1, অর্থাৎ $r=-1$।

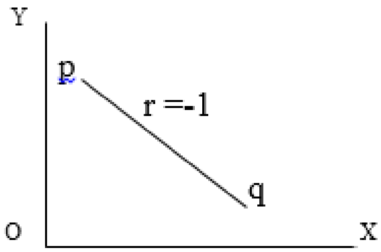

৩ নং চিত্র

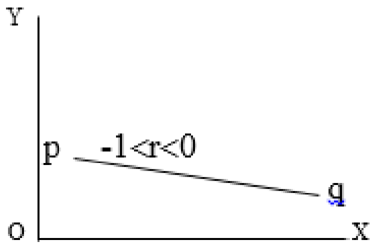

৪ নং চিত্র

৪. আংশিক ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক

যখন দুটি চলকের একটির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি অপর চলকটিও অসমান হারে বা অসমান অনুপাতে বিপরীত মুখী পরিবর্তন হয়, যেমন– প্রথম চলকটি যে হারে বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় চলকটি ভিন্ন হারে হ্রাস পায় আবার প্রথম চলকটি যে হারে হ্রাস পেলে দ্বিতীয় চলকটি ভিন্ন হারে বৃদ্ধি পায় তখন চলক্দ্বয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তাকে আংশিক ঋণাত্মকসহ-সম্পর্ক বলে। pq রেখায় x-এর মান যত বাড়ে y-এর মান তত কমে না আবার x-এর মান যে হারে কমে y এর মান সে হারে বাড়ে না। এরূপ ক্ষেত্রে আংশিক ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক নির্দেশ করে (৪নং চিত্র)। এক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মাত্রা হয় -1 থেকে 0-এর মধ্যে, অর্থাৎ $-1<r<0$।

৫. শূন্য সহ-সম্পর্ক

যখন দুটি চলকের একটির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে অপর চলকটি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ কোনো সম্পর্ক থাকে না তখন সে সম্পর্ককে বলা হয় শূন্য সম্পর্ক। অর্থাৎ চলকদ্বয়ের একটি অন্যটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। এক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মাত্রা হয় 0, অর্থাৎ $r = 0$ (৫ নং চিত্র)।

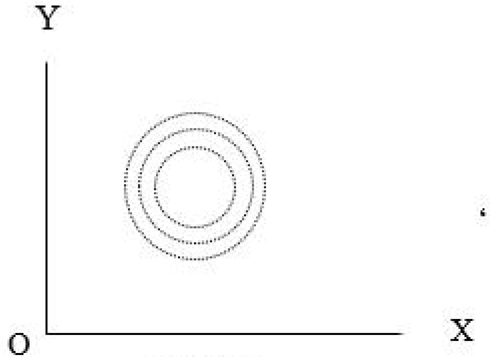

৫নং চিত্র

সহ-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য

- সহ-সম্পর্ক মূল ও মাপনী থেকে স্বাধীন।
- পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুটি চলকের মধ্যে একটি চলকের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অপর চলকেরও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে, তাদের মধ্যে ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।
- পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুটি চলকের মধ্যে একটি চলকের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অপর চলকের বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটলে, তাদের মধ্যে ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।
- পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুটি চলকের মধ্যে একটি চলকের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অপর চলকের সহগমনের অভাব ঘটলে, তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বা শূন্য সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।
- সহ-সম্পর্ক প্রতিসম। অর্থাৎ x ও y এর মধ্যে সহ-সম্পর্ক এবং y ও x এর মধ্যে সহ-সম্পর্ক একই।
- সহ-সম্পর্ক একটি একক মুক্ত রাশি বা বিশুদ্ধ সংখ্যা।

সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা সহগাঙ্কের তাৎপর্য

সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা অনুবন্ধ সহগ থেকে দুটি ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা তা জানা যায়। অনুবন্ধ সহগের মান ধনাত্মক হলে ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে বুঝতে হবে আর অনুবন্ধ সহগের মান ঋণাত্মক হলে ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে বুঝতে হবে। ফলাফল আংশিক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন সেটি তাৎপর্যহীন নয়। নিচের ছকে সহগাঙ্কের তাৎপর্য দেওয়া হলো। সহ-সম্পর্কের ফলাফল ব্যাখ্যায় এ সম্পর্ক অতীব জরুরি।

সহগাঙ্ক	সম্পর্ক
± 0.00 থেকে ± 0.20	উদাসীন/উপেক্ষণীয় (Negligible)
± 0.20 থেকে ± 0.40	খুব কম/নিম্নমানের বাস্তব সম্পর্ক (Low)
± 0.40 থেকে ± 0.70	বাস্তব ও মধ্যম মান/উল্লেখযোগ্য (Moderate)
± 0.70 থেকে ± 0.80	উচ্চমান সম্পন্ন/বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (High or substantial)
± 0.80 থেকে ± 0.99	অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন (Very High)
± 1.00	পরিপূর্ণ সহ-সম্পর্ক (Perfect Correlation)

শিক্ষা গবেষণায় সহ-সম্পর্কের ব্যবহার

শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা মূল্যায়নে সহ-সম্পর্কের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

১. **অভীক্ষার যথাযর্থতা নির্ণয় :**
সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা সহগাঙ্কের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়। অভীক্ষা তৈরির সময় তার সম্ভাবনামূলক ও সহাবস্থানমূলক যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য সহগাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

২. **অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় :**
অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণে সহ-সম্পর্ক ব্যবহৃত হয়। অভীক্ষার পুনঃপুন প্রয়োগলব্ধ ফলাফলের মধ্যে সহগাঙ্ক নির্ণয় করে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়।

৩. **অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণ :**
কোন অভীক্ষার পদগুলো কতটা কঠিন, তাদের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা কতটুকু ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য সহগাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। মোট কথা অভীক্ষা তৈরির সময় যখন পদ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন সহগাঙ্কের সাহায্য প্রয়োজন।

৪. **উপাদান বিশ্লেষণ :**
শিক্ষাগত পারদর্শিতা ও মানসিক প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো নির্ধারণ করার জন্য পারস্পরিক সহগাঙ্কের তালিকা বিশ্লেষণ করা হয়।

৫. **দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় :**
দুটি পরিবর্তনশীল চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এ সম্পর্কের প্রকৃতি এবং মাত্রা নির্ণয় করার জন্য সহগাঙ্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন– অধীন চলকের ভেদের কত অংশ স্বাধীন চলকের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা তাদের সহগাঙ্কের বর্গ দ্বারা পরিমাপ করা যায়। দুটি চলকের সহগাঙ্ক $r = 0.9$ অর্থাৎ $r^2 = 0.81$ হলে এটাই বোঝা যায় যে, অধীন চলকের মানের পরিবর্তনের 81% স্বাধীন চলকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

৬. **অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ণয় :**
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাহিদা ও মূল্য, উৎপাদন ও মূল্য ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সহগাঙ্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭. **নির্ভরণরেখা বিশ্লেষণ :**
নির্ভরাঙ্ক, নির্ভরণ রেখা, নির্ভরণ রেখার গতিপ্রকৃতি, নির্ভরণ রেখার ঢাল নির্ণয় ইত্যাদি কাজে সহগাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা সহগাঙ্ক নির্ণয় :

দুটি পদ্ধতির সাহায্যে সহগাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। যথা :

১. প্রোডাক্ট মোমেন্ট বা গড় গুণন পদ্ধতি (Product Moment Method)
২. সারি পার্থক্য বা গুণানুক্রমিক পদ্ধতি (Rank Difference Method)

৬.৪.২ : প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক কার্ল পিয়ারসন। কার্ল পিয়ারসনের মতে সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ এমন একটি পদ্ধতি যা যুক্ত বিন্যাসের পরস্পর নির্ভরশীল দুটি চলকের সরল রৈখিক সম্পর্ককে পরিমাপ করে। তার প্রবর্তিত পদ্ধতিকে প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি বলে। গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতিকে কোনো নির্দিষ্ট খাতে উন্নীত করে তাদের যোগফলকে মোট স্কোর (N) দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় মোমেন্ট (A moment is the sum of deviations from the mean raised to any power devided by N)। এ পদ্ধতিতে যে সহ-সম্পর্কের মাত্রা বা সহগাঙ্ক পাওয়া যায় তাকে r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয়

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে দুটি সূত্র দ্বারা সহ-সম্পর্কের মাত্রা r নির্ণয় করা যায়। যথা :

(১) দীর্ঘ পদ্ধতি এবং

(২) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

(১) **দীর্ঘ পদ্ধতির সূত্রঃ** সহ-সম্পর্ক (r) = $$\frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{\left(\sum x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{\left(\sum y\right)^2}{n}\right\}}}$$

দীর্ঘ পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয়

উদাহরণ-১ : নিচের দুটি বিষয়ের নম্বর হতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শিক্ষার্থীর নাম	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ
ইংরেজির নম্বর	40	58	54	45	25	62	34	52	44	47	41	45
বাংলার নম্বর	35	41	40	52	28	54	25	44	38	30	53	44

সমাধান :

শিক্ষার্থীর নাম	ইংরেজির নম্বর (x)	বাংলার নম্বর (y)	xy	x^2	y^2
ক	40	35	1400	1600	1225
খ	58	41	2378	3364	1681
গ	54	40	2160	2916	1600
ঘ	45	52	2340	2025	2704
ঙ	25	28	700	625	784
চ	62	54	3348	3844	2916
ছ	34	25	850	1156	625
জ	52	44	2288	2704	1936
ঝ	44	38	1672	1936	1444
ঞ	47	30	1410	2209	900
ট	41	53	2173	1681	2809
ঠ	45	44	1980	2025	1936
	$\sum x = 547$	$\sum y = 484$	$\sum xy = 22699$	$\sum x^2 = 26085$	$\sum y^2 = 20560$

আমরা জানি, সহ-সম্পর্ক (r)= $$\frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{\left(\sum x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{\left(\sum y\right)^2}{n}\right\}}}$$

সারণি থেকে পাই,
$\sum x = 547$
$\sum y = 484$
$\sum xy = 22699$
$\sum x^2 = 26085$
$\sum y^2 = 20560$
$n = 12$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (r) = $$\frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{\left(\sum x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{\left(\sum y\right)^2}{n}\right\}}}$$

$$= \frac{22699 - \frac{547 \times 484}{12}}{\sqrt{\left\{26085 - \frac{(547)^2}{12}\right\}\left\{20560 - \frac{(484)^2}{12}\right\}}}$$

$$= \frac{22699 - 22062.33}{\sqrt{\{26085 - 24934.08\}\{20560 - 19521.33\}}}$$

$$= \frac{636.67}{\sqrt{1150.92 \times 1038.67}}$$

$$= \frac{636.67}{\sqrt{119426.076}}$$

$$= \frac{636.67}{1093.355421}$$

$$= 0.58230$$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (r) = 0.58

ফলাফলের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় (0.58) ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

(২) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি :

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সূত্রঃ $$r = \frac{\sum d_x d_y - \frac{\sum d_x \sum d_y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum d_x{}^2 - \frac{\left(\sum d_x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum d_y{}^2 - \frac{\left(\sum d_y\right)^2}{n}\right\}}}$$

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় :

উদাহরণ-২ : বি.এড. অনার্স তৃতীয় পর্বের ১৫ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষায় 10 জন শিক্ষার্থীর বাংলা ও ভূগোল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিচে ছকে উল্লেখ করা হলো। উল্লিখিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শিক্ষার্থীর নাম	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর	8	8	9	11	9	10	12	12	11	10
ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বর	9	10	10	12	8	10	12	11	11	9

সমাধান :

শিক্ষার্থীর নাম	বাংলার নম্বর (x)	ভূগোলের নম্বর (y)	$d_x = x - A_x$	$d_y = y - A_y$	$d_x d_y$	$d_x{}^2$	$d_y{}^2$
ক	8	9	-2	-1	2	4	1
খ	8	10	-2	0	0	4	0
গ	9	10	-1	0	0	1	0
ঘ	11	12	1	2	2	1	4
ঙ	9	8	-1	-2	2	1	4
চ	$10 = A_x$	$10 = A_y$	0	0	0	0	0
ছ	12	12	2	2	4	4	4
জ	12	11	2	1	2	4	1
ঝ	11	11	1	1	1	1	1
ঞ	10	9	0	-1	0	0	1
	$\sum x = 100$	$\sum y = 102$	$\sum d_x = 0$	$\sum d_y = 2$	$\sum d_x d_y = 13$	$\sum d^2{}_x = 20$	$\sum d^2{}_y = 16$

আমরা জানি, সহ-সম্পর্ক (r) = $$\frac{\sum d_x d_y - \frac{\sum d_x \sum d_y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum d_x^2 - \frac{\left(\sum d_x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum d_y^2 - \frac{\left(\sum d_y\right)^2}{n}\right\}}}$$

সারণি থেকে পাই, $\sum d_x = 0$

$\sum d_y = 2$

$\sum d_x d_y = 13$

$\sum d_x^2 = 20$

$\sum d_y^2 = 16$

এবং $n = 10$

সূত্রে মান বসিয়ে পাই, $$r = \frac{\sum d_x d_y - \frac{\sum d_x \sum d_y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum d_x^2 - \frac{\left(\sum d_x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum d_y^2 - \frac{\left(\sum d_y\right)^2}{n}\right\}}}$$

$$= \frac{13 - \frac{0 \times 2}{10}}{\sqrt{\left\{20 - \frac{(0)^2}{10}\right\}\left\{16 - \frac{(2)^2}{10}\right\}}}$$

$$= \frac{13 - 0}{\sqrt{\{20 - 0\}\{16 - 0.4\}}}$$

$$= \frac{13}{\sqrt{312}}$$

= 0.73598

= 0.74 (cÖvq)

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (r) = 0.74 (প্রায়)

ফলাফলের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, বাংলা ও ভূগোল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে উচ্চ মাত্রার ধনাত্মক (0.74) সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূগোল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরেরও প্রায় একই রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ফলাফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উদাহরণ-৩ : নিচে প্রদত্ত 10 জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শিক্ষার্থীর নাম	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ইংরেজির নম্বর	40	58	54	45	25	62	34	52	44	47
গণিতের নম্বর	35	41	40	52	28	54	25	44	38	30

সমাধান :

শিক্ষার্থীর নাম	ইংরেজির নম্বর (x)	গণিতের নম্বর (y)	$d_x = x - A_x$	$d_y = y - A_y$	$d_x\ d_y$	$d_x^{\ 2}$	$d_y^{\ 2}$
ক	40	35	-5	-3	15	25	9
খ	58	41	13	3	39	169	9
গ	54	40	9	2	18	81	4
ঘ	$45 = A_x$	52	0	14	0	0	196
ঙ	25	28	20	–10	–200	400	100
চ	62	54	17	16	272	289	256
ছ	34	25	–11	–13	143	121	169
জ	52	44	7	6	42	49	36
ঝ	44	$38 = A_y$	–1	0	0	1	0
ঞ	47	30	2	–8	–16	4	64
	$\sum x = 461$	$\sum y = 387$	$\sum d_x$ =51	$\sum d_y$ =7	$\sum d_x d_y$ =313	$\sum d_x^{\ 2}$ =1139	$\sum d_y^{\ 2}$ =843

আমরা জানি, সহ-সম্পর্ক (r) = $$\frac{\sum d_x d_y - \dfrac{\sum d_x \sum d_y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum d_x^{\ 2} - \dfrac{\left(\sum d_x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum d_y^{\ 2} - \dfrac{\left(\sum d_y\right)^2}{n}\right\}}}$$

সারণি থেকে পাই, $\sum d_x = 51$

$\sum d_y = 7$

$\sum d_x d_y = 313$

$\sum d_x^{\ 2} = 1139$

$\sum d_y^{\ 2} = 843$

এবং $n = 10$

সূত্রে মান বসিয়ে,

$$r = \frac{\sum d_x d_y - \frac{\sum d_x \sum d_y}{n}}{\sqrt{\left\{\sum d_x{}^2 - \frac{\left(\sum d_x\right)^2}{n}\right\}\left\{\sum d_y{}^2 - \frac{\left(\sum d_y\right)^2}{n}\right\}}}$$

$$= \frac{313 - \frac{51 \times 7}{10}}{\sqrt{\left\{1139 - \frac{(51)^2}{10}\right\}\left\{843 - \frac{(7)^2}{10}\right\}}}$$

$$= \frac{313 - \frac{357}{10}}{\sqrt{\left\{1139 - \frac{2601}{10}\right\}\left\{843 - \frac{49}{10}\right\}}}$$

$$= \frac{313 - 35.7}{\sqrt{\{1139 - 260.1\}\{843 - 4.9\}}}$$

$$= \frac{277.3}{\sqrt{878.9 \times 838.1}}$$

$$= \frac{277.3}{\sqrt{736606.09}}$$

$$= \frac{277.3}{858.2575895}$$

$$= 0.3230964$$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (r) = 0.32

ফলাফলের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে আংশিক ধনাত্মক (0.32) সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান। ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের আংশিক হ্রাস-বৃদ্ধিতে গণিতে প্রাপ্ত নম্বরেরও আংশিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ চলকদ্বয়ের মধ্যে নিম্নমানের বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে।

৬.৪.৩ সারি পার্থক্য বা গুণানুক্রমিক পদ্ধতি (Rank Difference Method)

উপাত্তের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তবে বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই গুণানুযায়ী (Rank) সাজানো যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হতে পারে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, সততা, সৌন্দর্য, গায়ের বর্ণ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে দুটি চলকের সম্পর্কের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ণয়ে গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক (Rank Difference Method) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুটি সারির চলককে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। ক্রমানুসারে সাজানো অবস্থান হতে প্রাপ্ত সারি দুটির সহ-সম্পর্ককে গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক বা Rank Correlation বলে। গাণিতিক পরিমাপ করা সম্ভব এরূপ দুটি সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। তবে সাধারণত পরিমাপযোগ্য নয় এমন দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকেই গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্কের আলোচনার উদ্ভব হয়েছে। যেমন– বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ছেলের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা জানতে গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক ব্যবহার করা হয়। গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ককে গ্রীক অক্ষর ρ (rho) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক চার্লস এডওয়ার্ড স্পিয়ারম্যান ১৯০০ সালে সারি পার্থক্য পদ্ধতি বা গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক (Rank Difference Method) পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রদান করেন।

$$\rho = 1 - \frac{6\sum D^2}{N\left(N^2 - 1\right)}$$

এখানে, ρ = গুণানুক্রমিক সহ-সম্পর্ক

D = দুটি স্কোরের পাস্পরিক র‍্যাঙ্কের পার্থক্য

N = মোট স্কোর সংখ্যা

উদাহরণ-১ : নিচে প্রদত্ত দুটি অভীক্ষার স্কোরগুলো থেকে সারি পার্থক্য পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

শিক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
১ম অভীক্ষার স্কোর	30	33	34	36	39	45	44	42	47	49
২য় অভীক্ষার স্কোর	72	70	36	80	73	79	76	83	85	81

সমাধান :

শিক্ষার্থীর নাম	১ম অভীক্ষার স্কোর (x)	২য় অভীক্ষার স্কোর (y)	R_x	R_y	$D = R_x - R_y$	D^2
ক	30	72	10	8	2	4
খ	33	70	9	9	0	0
গ	34	36	8	10	-2	4
ঘ	36	80	7	4	3	9
ঙ	39	73	6	7	-1	1
চ	45	79	3	5	-2	4
ছ	44	76	4	6	-2	4
জ	42	83	5	2	3	9
ঝ	47	85	2	1	1	1
ঞ	49	81	1	3	-2	4
						$\sum D^2$ =40

সারণি থেকে পাই, $\sum D^2 = 40$

$N = 10$

$$\therefore \text{সহ-সম্পর্ক } (\rho) = 1 - \frac{6\sum D^2}{N(N^2-1)}$$

$$= 1 - \frac{6 \times 40}{10(10^2-1)}$$

$$= 1 - \frac{240}{10(100-1)}$$

$$= 1 - \frac{240}{10 \times 99}$$

$$= 1 - \frac{240}{990}$$

$$= 1 - 0.2424$$

$$= 0.7575$$

$$\therefore \text{সহ-সম্পর্ক } (\rho) = 0.76$$

ফলাফলের ব্যাখ্যা: উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, দুটো অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে উচ্চ মাত্রার ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলাফল (0.76) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উদাহরণ-২: নিম্নে ১০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণ উত্তর দুটি অভীক্ষার প্রাপ্ত স্কোর দেওয়া হলো। এ উপাত্ত থেকে সারি পার্থক্য পদ্ধতিতে সহগাঙ্ক নির্ণয় করুন।

প্রশিক্ষণার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
পূর্বে	17	15	13	14	18	17	16	15	13	12
পরে	14	16	15	16	17	19	15	18	15	14

সমাধান :

শিক্ষার্থীর নাম	প্রশিক্ষণের পূর্বে (x)	প্রশিক্ষণের পরে (y)	R_x	R_y	$D = R_x - R_y$	D^2
ক	17	14	2.5	9.5	–7	49
খ	15	16	5.5	4.5	1	1
গ	13	15	8.5	7	1.5	2.25
ঘ	14	16	7	4.5	2.5	6.25
ঙ	18	17	1	3	–2	4
চ	17	19	2.5	1	1.5	2.25
ছ	16	15	4	7	–3	9
জ	15	18	5.5	2	3.5	12.25
ঝ	13	15	8.5	7	1.5	2.25
ঞ	12	14	10	9.5	0.5	0.25
						$\sum D^2 = 88.50$

সারণি থেকে পাই, $\sum D^2 = 88.50$

$N = 10$

$$\text{সুতরাং সহ-সম্পর্ক } (\rho) = 1 - \frac{6\sum D^2}{N\left(N^2 - 1\right)}$$

$$= 1 - \frac{6 \times 88.50}{10\left(10^2 - 1\right)}$$

$$= 1 - \frac{531}{10(100 - 1)}$$

$$= 1 - \frac{531}{990}$$

$$= 1 - 0.53636$$

$$= 0.4636$$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (ρ) $= 0.46$

ফলাফলের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, দুটো অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে বাস্তব ও মধ্যম মান বা উল্লেখযোগ্য (Moderate) মাত্রার (0.46) ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ।

উদাহরণ-৩ : নিম্নে ১২ জন শিক্ষার্থীর দুটি সমান্তরাল অভীক্ষার প্রাপ্ত স্কোর দেওয়া হলো। এ উপাত্ত থেকে সারি পার্থক্য পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতার সহগাঙ্ক নির্ণয় করুন।

ছাত্র	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ
১ম অভীক্ষা	62	61	65	67	71	71	74	50	54	56	59	60
২য় অভীক্ষা	30	32	30	28	34	36	40	22	25	34	28	26

সমাধানঃ

শিক্ষার্থীর নাম	প্রশিক্ষণের পূর্বে (x)	প্রশিক্ষণের পরে (y)	R_x	R_y	$D = R_x - R_y$	D^2
ক	62	30	6	6.5	–0.5	0.25
খ	61	32	7	5	2	4
গ	65	30	5	6.5	–1.5	2.25
ঘ	67	28	4	8.5	–4.5	20.25
ঙ	71	34	2.5	3.5	–1	1
চ	71	36	2.5	2	0.5	0.25
ছ	74	40	1	1	0	0
জ	50	22	12	12	0	0
ঝ	54	25	11	11	0	0
ঞ	56	34	10	3.5	6.5	42.25
ট	59	28	9	8.5	0.5	0.25
ঠ	60	26	8	10	–2	4
						$\sum D^2 = 74.50$

সারণি থেকে পাই, $\sum D^2 = 74.50$

$N = 12$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (ρ) $= 1 - \dfrac{6\sum D^2}{N(N^2-1)}$

$$= 1 - \frac{6 \times 74.50}{12(12^2-1)}$$

$$= 1 - \frac{447.00}{12(144-1)}$$

$$= 1 - \frac{447.00}{12 \times 143}$$

$$= 1 - \frac{447}{1716}$$

$$= 1 - 0.2604$$

$$= 0.7396$$

$\therefore$ সহ-সম্পর্ক (ρ) $= 0.74$

ফলাফলের ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, দুটো অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে উচ্চ মাত্রার ধনাত্মক (0.74) সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলাফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৬.৪.৪ : স্বাভাবিক বণ্টন বা পরিমিত বিন্যাস (Normal Distribution)

পরিসংখ্যানে সর্বাধিক আলোচিত প্রামাণিক বিন্যাস হলো স্বাভাবিক বা পরিমিত বিন্যাস। পরিসংখ্যানে এর ব্যবহারও অনেক বেশি। এর সাহায্যে যে কোনো তথ্যের বণ্টন অবস্থার পরীক্ষা করা যায় এবং এর সাহায্যে নমুনাকে পরিমিত বিন্যাসের সংগে তুলনা করে তার সমগ্রক সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া যায়। নমুনার আকার বড় হলে তার বিন্যাস প্রায়ই পরিমিত বিন্যাসের কাছাকাছি হয় এবং পরিমতি বিন্যাসের সাহায্যে তা সমাধান করা যায়। উৎপাদনের উৎকর্ষতা, ওজন, উচ্চতা, কৃষ্টি ইত্যাদি এই বিন্যাসের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়। বিখ্যাত গণিতবিদ ডি. ময়ভার (D. Moiver) সর্ব প্রথম এই বিন্যাসের মৌলিক ধারণা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে গণিতবিদ কার্ল গস (Karl Gauss) এবং ল্যাপলাস (Laplace) এই বিন্যাসের ধারণাটিকে আরো ব্যাপকতর করে তুলেছিলেন। গসের নামানুসারে এই বিন্যাসকে গসিয়ান বিন্যাস (Gaussian Disrtibution) বলে। পরিমিত বিন্যাস হলো অবিচ্ছিন্ন চলকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা বিন্যাস।

পরিমিত বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রকৃতির বিন্যাস হলো পরিমিত বিন্যাস। যদি কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের জন্য অঙ্কিত গণসংখ্যা রেখার প্রচুরকের উভয় পার্শ্ব সমানভাবে বিস্তৃত হয়, তবে তাকে স্বাভাবিক বণ্টন বা পরিমিত বিন্যাস বলে। পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা রেখাকে পরিমিত রেখা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিমিত বিন্যাসকে লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে পরিমিত রেখা বলে।

বিভিন্ন বন্টনের একটি মৌলিক আকার বা রূপ থাকে। এই মৌলিক আকার বা রূপকে বলা হয় স্বাভাবিক বন্টন এবং বন্টনের রেখাচিত্রকে বলা হয় স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্র বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র। একে গসিয়ান চিত্রও বলা হয়। পরিমাপের ত্রুটি নির্ণয়ে এ ধরনের চিত্র ব্যবহার করা হয়। এই রেখাটি অনেকটা ঘণ্টা আকৃতির হয়ে থাকে। রেখাটির দুই প্রান্ত অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় কিন্তু অক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে না। নিচে স্বাভাবিক সম্ভাবনার একটি চিত্র দেওয়া হলো।

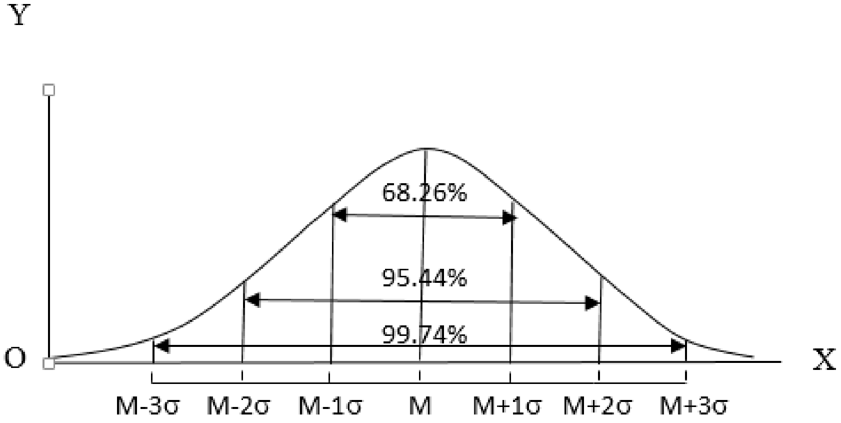

চিত্র: স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য

- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের আকৃতি গরুর গলার ঘণ্টার মতো। তাই একে ঘণ্টাকৃতি চিত্র বলে।
- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রটি অবিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসের চিত্র।
- স্বাভাবিক বন্টনে গড়, মধ্যক এবং প্রচুরকের মান সমান হয় এবং লেখচিত্রের মধ্য অক্ষের পাদবিন্দুতে অবস্থান করে।
- এর দুটি পরামিতি। একটি M এবং অপরটি σ।
- এটি একটি সুষম বিন্যাসের চিত্র। মধ্যস্থল সমুন্নত। উভয় দিকে রেখাটি নিম্নমুখী। X-এর মান বাড়তে থাকেলে Y-এর মান বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধিটা একটি চরম অবস্থায় পৌছানোর পর X-এর মান বাড়তে থাকেলে Y-এর মান কমতে থাকে। চরম অবস্থা মানে হলো চিত্রটির চূড়া যা তার সর্বোচ্চ উচ্চতা।
- লেখচিত্রটি মূল অক্ষের ছেদ বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে X অক্ষের দিকে নেমে আসে। কিন্তু তা কখনই X অক্ষকে স্পর্শ করে না। সুতরাং বলা যায় লেখচিত্রটি অসীম।
- লেখচিত্রটি অসীম হলেও স্বাভাবিক বন্টনে ৯৯.৭৪% স্কোর M-3σ থেকে M+3σ এর মধ্যে থাকে।
- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো: এর বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক সম্পর্ক সব সময় বজায় থাকে।
- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অক্ষের দুই বিন্দুর অন্তর্গত ক্ষেত্রফল সব সময় স্থির থাকে।
- এই বিন্যাসটির বঙ্কিমতার মান শূন্য হয়।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রে নম্বর বন্টন বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা প্রদান

স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রে X অক্ষ রেখায় গাণিতিক গড়কে কেন্দ্ররূপে বিবেচনা করে কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ গড় থেকে ডান দিকে তিনটি এবং বাম দিকে তিনটি মোট ৬টি সমান ভাগে অক্ষ রেখাটি বিভক্ত করা হয়। ভাগগুলোকে σ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ডান দিকের স্কোরগুলোর জন্য ‘+’ এবং বাম দিকের স্কোরগুলোর জন্য ‘−’ ব্যবহার করা হলে সমস্ত বন্টনটি M±3σ-এর মধ্যে

অবস্থান করে। স্কোরের সংখ্যা সব জায়গায় সমান না থাকায় ক্ষেত্রফলও সব জাগায় সমান নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বণ্টনের ক্ষেত্রফল বিভিন্ন। নিচে বণ্টনের ক্ষেত্রফলের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

সিগমা (σ) লিমিট	স্কোর
$M+1\sigma$ এর মধ্যে $M-1\sigma$ এর মধ্যে $\therefore M\pm1\sigma$ এর মধ্যে	34.13% স্কোর 34.13% স্কোর 68.26% স্কোর
$M+2\sigma$এর মধ্যে $M-2\sigma$এর মধ্যে $\therefore M\pm2\sigma$ এর মধ্যে	47.72% স্কোর 47.72% স্কোর 95.44% স্কোর
$M+3\sigma$এর মধ্যে $M-3\sigma$এর মধ্যে $\therefore M\pm3\sigma$ এর মধ্যে	49.87% স্কোর 49.87% স্কোর 99.74% স্কোর

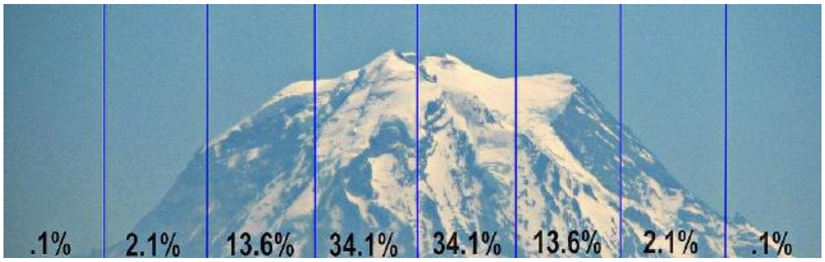

চিত্র: প্রকৃতির স্বাভাবিক সম্ভাবনা

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের শিক্ষামূলক তাৎপর্য বা ব্যবহার

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের সাহায্যে শিক্ষামূলক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও শিক্ষামূলক তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- **শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পারদর্শীতা নির্ণয় :** শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপগুলো স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। এ লেখচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ধারণা পাওয়া যায়।
- **প্রশ্নপত্রের কাঠিন্য মান নির্ণয় :** স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের সাহায্যে শিক্ষামূলক পরিমাপের প্রশ্নপত্রের কাঠিন্য মান (difficulty value) নির্ণয় করা যায়।
- **প্রশ্নপত্রের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা নির্ণয় :** শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা আদর্শায়িত করার সময় স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলোর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা নির্ণয় করা সম্ভব।
- **পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় :** স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের সাহায্যে কোনো বিশেষ পরিমাপ কতটা নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করা যায়।
- **সীমিত সংখ্যক তথ্যকে ব্যাপক অর্থে প্রকাশ :** স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের সাহায্যে সীমিত সংখ্যক তথ্যকে ব্যাপক অর্থে এবং বৃহৎ তাৎপর্যে বিচার করা যায়। এ লেখচিত্র নমুনা তথ্যকে সাধারণ ও সামগ্রিক রূপ দিতে সাহায্য করে।

- **প্রাকৃতিক পরিমাপ :** নানাবিধ প্রাকৃতিক পরিমাপের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার বণ্টন :** বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা যেমন–সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি, পর্যবেক্ষণমূলক ভুল, জীবতত্ত্বমূলক পরিমাপ, মানবতত্ত্বমূলক পরিমাপ, মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ইত্যাদির বণ্টন স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের আকৃতিকে অনুসরণ করে।

৬.৫ : গুণগত গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ

(Data Analysis of Qualitative Research)

সেই আদিকাল থেকেই রয়েছে মানুষের আবিষ্কারের নেশা, রয়েছে জ্ঞান পিপাসা। মানুষ অজানাকে জানতে চায়, অচেনাকে চিনতে চায়। এই আবিষ্কারের নেশা ও জ্ঞান পিপাসা থেকে জন্ম নিয়েছে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সুনির্দিষ্ট রূপের নাম গবেষণা। মানুষের মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা থেকে বর্তমানের গবেষণার উৎপত্তি। বর্তমান গবেষণার রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে নতুন নতুন জ্ঞান বা তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে আরো সুখী ও আরামপ্রদ করতে প্রকৃতির বিরূপতার উপর মানুষের বিজয় অর্জন। মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল বিদ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, কারিগরি ও শিল্পোন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তি, খাদ্য ও পুষ্টিখাত উন্নত করা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নত জীবন বোধ নির্মাণ, ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা রকম গবেষণা রয়েছে। বর্ণনামূলক গবেষণা তার মধ্যে একটি। বর্ণনামূলক গবেষণা আবার দুই প্রকার, যথাঃ পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research) ও গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর ওজন, উচ্চতা অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করা হলে তখন তা পরিমাপ। পরিমাপ মানে মাত্রা নির্ধারণ। এ গবেষণা মূলত পরিমাণের ভিত্তিতে করা হয়। যে সব গবেষণার তথ্যাদিকে গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করা হয় তাদের পরিমাণগত গবেষণা বলে। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গবেষণা রয়েছে যা সহজে ও সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এ সব গবেষণা শুধু তার গুণের বিচারে করা হয়। এগুলো হলো গুণগত গবেষণা। গুণগত গবেষণা কোনো গুণবাচক বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে। এদের তথ্যাদি গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় না। গুণগত গবেষণায় সকল উপাদান, তথ্যাদিকে গাণিতিক সংখ্যা ছাড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করা হয়। গাণিতিক সংখ্যা ছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্যাদি সংগ্রহ, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ফলাফল তৈরি ইত্যাদিতে বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করা হলে তাকেই গুণগত গবেষণা বলে। মানব আচরণ বা Human Behaviour-এর সম্পর্কে যেমন– ব্যক্তিত্ব, সততা, নৈতিকতা, অধ্যাবসায়, নির্ভরযোগ্যতা, জ্ঞান, মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, কাজ করার উৎসাহ, কর্মচঞ্চলতা, কর্মশক্তি, রূপ, ধৈর্য, সহনশীলতা, আগ্রহ, বন্ধুত্ব, নেতৃত্ব, সহযোগিতামূলক যোগ্যতা, শৃঙ্খলা, সময় জ্ঞান, বিচার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সমন্বয় ক্ষমতা, তত্ত্বাবধায়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, আন্তব্যক্তিক দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা হলো গুণগত গবেষণা। গুণগত গবেষণা বেশ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কারণ এর উদ্দেশ্য হলো Human Behaviour-এর অন্তর্নিহিত Motive আবিষ্কার করা। এ ধরনের গবেষণা সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। এ জাতীয় গবেষণা অনেকটা উন্মুক্ত ও নমনীয়। গুণগত গবেষণা সহজে পরিমাপ করা যায় না। এতে বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একটি গুণগত গবেষণার শিরোনাম হতে পারে “বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে নারী শিক্ষার ভূমিকা”। গুণগত গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ কোনো অভীক্ষার সাহায্যে করা যায় না। এর উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে করা হয়। নিম্নে কয়েকটি কৌশল উল্লেখ করা হলো। যথাঃ

১. রেটিং স্কেল,

২. সমাজমিতিমূলক,

৩. চেকলিস্ট,

৪. ইনভেনটরি বা তালিকা,

৫. স্কোর কার্ড,

৬. নমুনা স্কেল

১. রেটিং স্কেল

গুণগত গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে অধিক ব্যবহৃত একটি টুলস হলো রেটিং স্কেল। শিক্ষার কোনো বিষয়ের উপর উত্তরদাতার মতামত প্রকাশের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যম হলো রেটিং স্কেল। ব্যক্তির কার্যাবলি, বৈশিষ্ট্য, গুণ অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বসহ অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে অন্য কোনো ব্যক্তির মতামতকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী প্রকাশ করার বিশেষ পদ্ধতির নাম রেটিং স্কেল। "কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ও আত্মপর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সুসংহত ও নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার কৌশলকে রেটিং স্কেল বলে। এ স্কেল যথেষ্ট নমনীয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, ব্যক্তিত্বের গুণাবলি, উদারতা, পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, সততা, পাঠাভ্যাস, সামাজিক মূল্য, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। এছাড়াও কোনো ঘটনা, বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে অন্য ব্যক্তি বা দলের অভিমত নির্দেশের প্রত্যক্ষ মাধ্যম হলো রেটিং স্কেল। অভিক্ষক ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করেন তাও জানা যায়। ব্যক্তি নিজেও নিজের রেটিং করতে পারেন, একে বলা হয় সেল্ফ রেটিং (Self Rating)।

বিভিন্ন রেটিং স্কেল

শিক্ষা গবেষণার জরিপ পদ্ধতিতে রেটিং স্কেল বেশি ব্যবহার করা হয়। কেননা এ স্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য অতি সহজে পরিমাপ করা যায়। শিক্ষা গবেষণায় গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের রেটিং স্কেল ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি রেটিং স্কেলের নাম উল্লেখ করা হলো-

ক) টেবিল রেটিং স্কেল,
খ) রৈখিক রেটিং স্কেল,
গ) সংখ্যাভিত্তিক রেটিং স্কেল,
ঘ) ক্রমসমষ্টিমূলক রেটিং স্কেল,
ঙ) স্ট্যান্ডার্ড রেটিং স্কেল,
চ) বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং স্কেল

ক) টেবিল রেটিং স্কেল (Table Rating Scale)

এ স্কেল তিন, পাঁচ, সাত বা দশ পয়েন্টে ভাগ করে নেওয়া যায়। যে ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য, গুণ ইত্যাদির মাত্রা নিরূপণ করতে হয় সেটি এবং তার বিপরীতটি নিয়ে একটি টেবিলে স্থাপন করতে হয়। উত্তরদাতা তার পছন্দনীয় ঘরে টিক (✓) দিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। নিম্নে পাঁচ পয়েন্টের টেবিল রেটিং স্কেলের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ-১ : আদিলা তাসনীম, তাহসীন আবরার, তাপতী, জারিপ, তাহমীদ, তারিণ ও শারিকার কাছে গণিত কতটুকু ভালো লাগে?

নাম	খুব বেশি ভালো	খুব ভালো	ভালো	মোটামুটি	খারাপ	খুব খারাপ	খুব বেশি খারাপ
আদিলা তাসনীম		✓					
তাহসীন আবরার	✓						
তাপতী						✓	
জারিপ			✓				
তাহমীদ				✓			
তারিণ					✓		
শারিকা							✓

খ) রৈখিক রেটিং স্কেল (Graphic Rating Scale)

জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত একটি রেটিং স্কেল। এই স্কেল একটি সরলরেখা সহযোগে পর্যবেক্ষকের জন্য তিন, পাঁচ, সাত বা দশ রকমের পয়েন্ট বা সংকেত প্রদান করে মতামত দিতে বলা হয়।

উদাহরণ-২ : আদিলা, আবরার, তাপতী, বিপতী, তাহমীদ ও তারিণ কতটুকু সামাজিক?

	অতিরিক্ত অসামাজিক	বেশ অসামাজিক	সামাজিক	বেশ সামাজিক	অতিরিক্ত সামাজিক
আদিলা					✓
আবরার			✓		
জারিপ	✓				
তাহমিদ				✓	
শারিকা		✓			

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে একটি রৈখিক স্কেল উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো :

উদাহরণ-৩ : সবকিছু বিবেচনা করে সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব নিয়ে তুমি কতটুকু সুখি?

খুব বেশি সুখী	যথেষ্ট সুখী	সুখী	মোটামুটি সুখী	অসুখী	বেশি অসুখী	চরম অসুখী

গ) সংখ্যাভিত্তিক রেটিং স্কেল (Numerical Rating Scale)

এই স্কেলে গবেষক পর্যবেক্ষকের প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারণ করেন। এভাবে যতটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা লিপিবদ্ধ করে প্রতিটির জন্য একটি সংখ্যা চিহ্নিত করেন। ১৯৭১ সালে গিলফোর্ট মানুষের মনে কোনো রং কতটুকু আবেগ সৃষ্টি করতে পারে তা পরিমাপ করার জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি সংখ্যাভিত্তিক রেটিং স্কেল তৈরি করেন :

১. চরম পীড়াদায়ক
২. খুব বেশি পীড়াদায়ক
৩. বেশি পীড়াদায়ক
৪. মোটামুটি পীড়াদায়ক
৫. কিছুটা পীড়াদায়ক
৬. মৃদু আনন্দদায়ক
৭. মোটামুটি আনন্দদায়ক
৮. অত্যন্ত আনন্দদায়ক
৯. খুব বেশি আনন্দদায়ক
১০. চরম আনন্দদায়ক বা অকল্পনীয় আনন্দদায়ক

রেটিং স্কেল বিভিন্নভাবে করা যায়। কখনও সংখ্যা দিয়ে, কখনও অক্ষর দিয়ে রেটিং স্কেল তৈরি করা যায়। নিম্নে পাঁচ পয়েন্টের একটি রেটিং স্কেল উদাহরণ হিসেবে দেখানো হলো :

1	2	3	4	5
-2	-1	0	1	2
A	B	C	D	E
A^{--}	A^{-}	A	A^{+}	A^{++}

ঘ) ক্রমসমষ্টিমূলক রেটিং স্কেল (Cumulative Rating Scale)

সাফল্যাঙ্ক বা সংখ্যামান প্রদানের রীতিকে ক্রমসমষ্টিমূলক রেটিং স্কেল বলে। এর পরিমাপ পর্যায় হলো চলকগুলোকে উচ্চ হতে নিম্ন বা নিম্ন হতে উচ্চ এর ভিত্তিতে ক্রমানুসারে শ্রেণিকরণ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যামান কতকগুলো পয়েন্টের সমষ্টি বা গড়। কতকগুলো প্রশ্নের নম্বর যোগ করে রেটিং স্কেল তৈরি করা হয়। একটি উদাহরণ সহকারে বিষয়টি পরিষ্কার করা হলোঃ মনোবিজ্ঞানী Hartshorne and May ১৯২৯ সালে শিশুদের চরিত্র পরিমাপ করার জন্য এই স্কেল ব্যবহার করেন। শিশুদের ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করা যায় এমন অনেকগুলো ভালো ও মন্দ বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা থেকে ৮০টি বৈশিষ্ট্যের নাম নির্বাচন করেন। যেমন–

দানশীল
নিঃস্বার্থ
সহযোগী
চিন্তাশীল
নিষ্ঠুর
কর্তব্য পরায়ণ
নিষ্ঠাবান
হাসিখুশি
লোভী
উদাসীন
কটুভাষী
অবিবেচক
বিনীত
মানবিক
রুচিশীল
বিরক্তকর

একটি শিশু সম্পর্কে যে সব গুণ প্রযোজ্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সেগুলোতে টিক চিহ্ন দেন। তৎপর প্রত্যেক ভালো বৈশিষ্ট্যের জন্য +১ এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যের জন্য -১ ধরে সে হিসেবে সম্পূর্ণ গুণাবলিকে মূল্যায়ন করা হয়। সবগুলো মূল্যায়নের সমষ্টিই শিশুর সাফল্যাঙ্ক। রেটিং করার সময় শুধু স্মৃতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে যদি পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করা হয় তাহলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অধিক নির্ভরযোগ্য হয়।

ঙ) স্ট্যান্ডার্ড রেটিং স্কেল (Standard Rating Scale)

এ রেটিং স্কেলে পর্যবেক্ষককে কতকগুলো উদ্দীপকের স্ট্যান্ডার্ড নমুনা প্রদান করা হয়। যেমন– হাতের লেখার সৌন্দর্য বিচার করার জন্য এই রেটিং স্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হাতের লেখার কতকগুলো নমুনা সংগ্রহ করে সমব্যবধান স্কেলে সেগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করে পর্যবেক্ষকের সামনে হাজির করা হয়। এরপর পর্যবেক্ষককে নমুনার সাথে একটি নতুন লেখার রেট করতে বলা হয়। পর্যবেক্ষক নমুনাগুলোর সাথে লেখাটিকে মিলিয়ে দেখেন এবং যে নমুনাটির সাথে লেখাটির সবচেয়ে বেশি মিল তিনি খুঁজে পান সে নমুনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সংখ্যামান প্রদান করেন। কোনো নমুনার সাথে হুবহু না মিললে নমুনার মাঝামাঝি কোনো একটি সংখ্যা প্রদান করেন।

চ) বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং স্কেল (Forced Choice Rating Scale)

এটি সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবিত একটি পদ্ধতি। কর্মচারিদের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই রেটিং স্কেল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আছে কি নেই, থাকলে কতটুকু আছে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্যক্তির জন্য কোনোটি প্রযোজ্য। বিভিন্ন রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেই বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং স্কেল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

রেটিং স্কেলের অসুবিধা :

রেটিং স্কেল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মতামত জ্ঞাপন ও লিপিবদ্ধ করার একটি সুসংহত উপায়। মতামত জ্ঞাপন ও লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যথা :

- **পরীক্ষকের প্রভাব :** পরীক্ষক নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রেটিং স্কেল তৈরি করে থাকেন। ফলে এ রেটিং স্কেল নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।
- **বদান্যতা ত্রুটি :** পরীক্ষকের নিজের পরিচিত কোনো ব্যক্তির গুণ সম্পর্কে পূর্ব ধারণার ভিত্তিতে তাকে স্কেলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিতে পারেন। যদিও পরিচিত ব্যক্তি ঐ স্থানের উপযুক্ত নয়।
- **হ্যালো এ্যাফেক্ট :** ব্যক্তির কোনো লক্ষণ সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা থাকলে সেই ধারণা অন্য কোনো সংলক্ষণের রেটিংকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে নতুন রেটিং হতে পারে খুব বেশি বা খুব কম।

উত্তম রেটিং স্কেলের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি

একটি উত্তম রেটিং স্কেল তৈরির সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা জরুরি। যেমন–

- প্রত্যেক স্কেলের মাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করতে হবে। মাত্রগুলো যেন খুব বেশি বা খুব কম না হয়। পাঁচ বা সাত মাত্রার স্কেল অতি উত্তম বলে পরিগণিত হয়।
- পরীক্ষকের রেটিং-এর বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- যে গুণ, বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা সম্পর্কে রেটিং করা হবে তার একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে।
- একাধিক পরীক্ষকের সমন্বয়ে তৈরিকৃত রেটিং স্কেল অনেক নির্ভরযোগ্য।
- পরীক্ষক হবেন পক্ষপাতিত্বহীন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে সকল ত্রুটি থেকে রেটিং স্কেলকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

২. সমাজমিতিমূলক কৌশল (Sociometric Technique)

সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সমাজমিতিমূলক কৌশলের সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হয়। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্ক কিরূপ, সমাজে স্থান কিরূপ, সামাজিক গুণাবলি তার মধ্যে কী পরিমাণে আছে তা সমাজমিতিমূলক কৌশলের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। জে. এল. মরেনো (J. L. Moreno) এই কৌশলের উদ্ভাবক। একটি বিশেষ দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক থাকা সম্ভব। সদস্যদের এ সম্পর্ককে একটি রৈখিক চিত্র আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই রৈখিক চিত্রটিকেই বলা হয় সোসিওগ্রাম (Sociogram) আর কৌশলটিকে বলা হয় সমাজমিতিমূলক কৌশল বা অভীক্ষা। চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন লোকের সঠিক সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ সোসিওগ্রামের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তির স্থান কিরূপ তা জেনে তাকে সেভাবেই পরিচালিত করা যায়। সমাজের কোনো সদস্যর যে সামাজিক গুণ বেশি আছে, তার সেই গুণ ভালোভাবে বাঞ্ছিত পথে বিকশিত হয়, তা দেখা হয়। সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ব্যক্তি যেন সকলের অবহেলার ফলে হীনমন্যতায় না ভোগে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের একজন করে সঙ্গী নির্বাচন করতে বলা হলো। শিক্ষার্থীদের পছন্দের উপর ভিত্তি করে সোসিওগ্রাম দেখানো হলো :

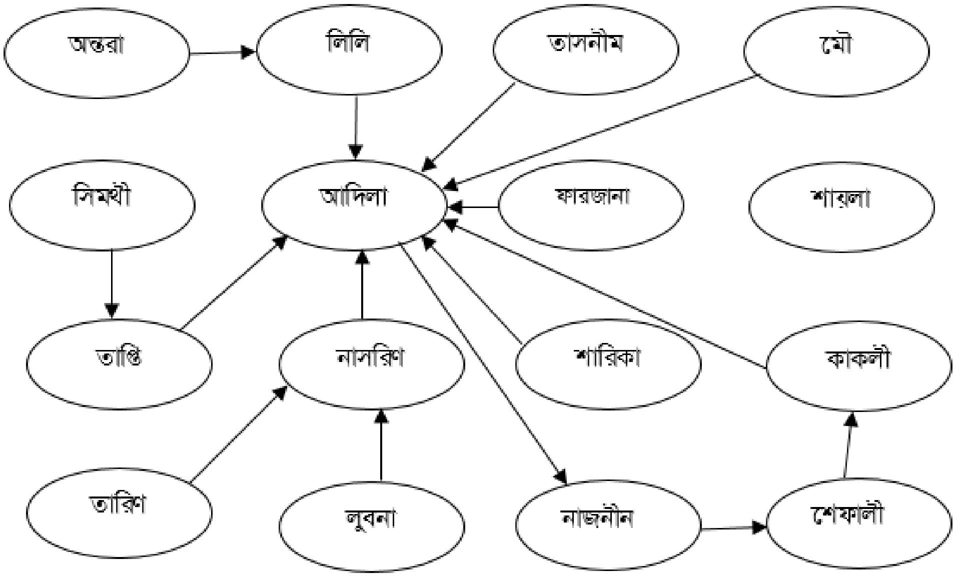

চিত্র: সোসিওগ্রাম

চিত্রে দেখা যায়, আদিলাকে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। তাকে স্টার বলা যায়। আবার শায়লাকে কেউই সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়নি। সুতরাং শায়লা অপাংক্তেয় (Isolated)।

সমাজমিতিমূলক কৌশলের নীতি

আধুনিক কালে শিক্ষা গবেষণা বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমাজমিতিমূলক কৌশলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়।

- সামাজিক কাঠামোর স্তর পছন্দ অবশ্যই বাস্তব এবং শ্রেণির স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হতে হবে।
- পছন্দের ভিত্তি এবং সীমাবদ্ধতা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- গবেষণা দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী বা সদস্যের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ থাকতে হবে।
- গবেষণা দলের সদস্যের পছন্দকে গোপন রাখতে হবে।
- গবেষণার চাহিদামতো দলকে সংগঠিত, পুনঃসংগঠিত বা পুনঃসজ্জিত করতে অভীক্ষকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে হবে।
- অভীক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণার দল, বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে নিতে হবে।
- তথ্য সংগ্রহের বেলায়ও ক্ষেত্র এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে নিতে হবে।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রের বেলায় উত্তরদাতার উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, নাম ঠিকানা সংগ্রহ করতে হবে।
- সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা প্রমানের জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যাবে।

সমাজমিতিমূলক কৌশলের গুরুত্ব

শিক্ষা গবেষণা বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমাজমিতিমূলক কৌশলের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিশেষ করে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও গুণাগুণ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে। নিচে সমাজমিতিমূলক কৌশলের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

- তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়,
- তথ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারা যায়,

- গবেষণা দলের ভেতরের ও বাইরের তথ্যাদির স্বরূপ জানা যায়,
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়,
- নারী পুরুষের ভিন্নতার মূল্যায়ন করা যায়,
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তার শ্রেণিভিত্তিক সাংগঠনিক কর্মের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

৩. চেক লিস্ট (Check List)

চেক লিস্ট হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা আচরণসমূহের পূর্বে তৈরিকৃত তালিকা। এই লিস্টে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কতকগুলো আচরণ থাকে। উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় ঐ সব বৈশিষ্ট্য বা আচরণসমূহের কতকগুলো উপস্থিত আছে আর কতকগুলো নেই। পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত, হ্যাঁ বা না দ্বারা তালিকাটি পূরণ করা হয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি বেশি সহায়ক। কোনো বিষয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করার সময় দেখা হয় নির্ধারিত যে সব উপাদান উক্ত বিষয়ে থাকা উচিৎ ছিল তা আছে কিনা। যদি পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত ইত্যাদির দ্বারা তালিকাটি পূরণ করে এদের একটি মূল্যসূচক তৈরি করা হয়। পর্যাপ্ততা বেশি থাকলে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয়। গাড়ি ক্রয় করা, গাড়ির গ্যারেজ ভাড়া করা, বাড়ি ক্রয় করা বা বাড়ি/বাসা ভাড়া নিতে চেক লিস্টের ব্যবহার করা হয়। একজন মানুষ, মানুষ হিসেবে কতটা ভালো বা মন্দ তা যাচাইয়ের জন্যও চেক লিস্ট ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের সময় কী কী যোগ্যতা পরীক্ষা করা হবে সেগুলো একটি ছকের মাধ্যমে চেক করার উপায় হচ্ছে চেক লিস্ট। একটি বাড়ি/বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য কাল্পনিক চেকলিস্ট দেখান হলো।

ক্রম	শিরোনাম	পর্যাপ্ত (+)	অপর্যাপ্ত (-)
১.	অবস্থান		
২.	পার্শ্ববর্তী রাস্তা		
৩.	পার্শ্ববর্তী রাস্তায় চলাচলের সুবিধা		
৪.	গাড়ির গ্যারেজের সুবিধা		
৫.	গাড়ি রাখার পর তার চার পাশের জায়গার সুবিধা		
৬.	গাড়ি ঘোরানোর সুবিধা		
৭.	নিরাপত্তার সুবিধা		
৮.	আলো বাতাসের সুবিধা		
৯.	পানি নিষ্কাশন সুবিধা		
১০.	পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা		
১১.	বাড়ির দারোয়ান সুবিধা		
১২.	খাবার পানির সুবিধা		
১৩.	বাথরুম সুবিধা		
১৪.	রান্না ঘরের সুবিধা		
১৫.	পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের সুবিধা		
১৬.	বাড়ি থেকে প্রধান রাস্তায় বের হওয়ার সুবিধা		
১৭.	লেখা-পড়ার/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা		
১৮.	সন্তানদের খেলাধুলার সুবিধা		
১৯.	বিনোদনের সুবিধা		
২০.	কর্মক্ষেত্রে গমনের সুবিধা		
২১.	কাছাকাছি হাট-বাজারের সুবিধা		
২২.	ভাড়ার পরিমাণের সুবিধা		
২৩.	কক্ষের আকার-আকৃতির সুবিধা		
২৪.	বারান্দার সুবিধা		
২৫.	বাড়ির ছাদ/আঙ্গিনা ব্যবহারের সুবিধা		

- পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত প্রত্যেকটির জন্য ৫ নম্বর।

ধরি, নাসরিণ আকতার একজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য এ রকম একটি চেক লিস্ট ব্যবহার করে পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ততার জন্য টিক চিহ্ন (✓) দেন। ২৫ পয়েন্টের তালিকার ১৫টি পর্যাপ্ত এবং ১০টি অপর্যাপ্ত পয়েন্টে টিক চিহ্ন দিলেন। মোট স্কোর হলো, ১৫×৫ – ১০×৫ = ৭৫–৫০ = ২৫। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, বাসাটি তিনি ভাড়া নিবেন।

৪. ইনভেনটরি (Inventory)

কিছু জিনিসের, উপাদানের, আচরণগত বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা হলো ইনভেনটরি। এটি হতে পারে ব্যক্তির পছন্দ বা অপছন্দের তালিকা, হতে পারে ব্যক্তিত্বের কোনো বিশেষ উপাদানের ভালো বা মন্দ দিক, আবার হতে পারে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের কোনো উপাদানের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার পরিমাণ। তালিকা আকারে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয় উত্তর বা মতামত প্রদানের জন্য। ব্যক্তি নিজের পছন্দ বা অপছন্দের তালিকা বিশেষ চিহ্ন দ্বারা পূরণ করতে পারে। তালিকা দ্বারা ব্যক্তির আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব, বিশেষ ঝোঁক ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ঐ প্রতিষ্ঠানের উপাদানগুলোর একটি তালিকা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানে তালিকার কোনো কোনো উপাদান আছে বা কোনো কোনো উপাদান নেই তা চিহ্নিত করতে বলা হয়। চিহ্নিত তালিকা থেকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর একটি তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। ইনভেনটরি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজেই তথ্য প্রদান করে থাকেন।

৫. স্কোর কার্ড (Score Card)

রেটিং স্কেল ও চেকলিস্টের সমন্বয়ে স্কোর কার্ড তৈরি করা হয়। যে বিষয়, উপাদান, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে স্কোর কার্ড ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির জন্য একটি মূল্যমান ধরা হয়। এরূপে স্কোর কার্ডের মাধ্যমে সমগ্র তালিকার একটি হিসেব পাওয়া যায় যা পর্যবেক্ষণের বিষয়টি মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয় কোনো বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের বা কোনো গোষ্ঠির বা ভবনের মূল্যায়নের সময় স্কোর কার্ড ব্যবহৃত হয়। মূল্যায়নের স্বীকৃত সংস্থা, বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ সাধারণত স্কোর কার্ডের মধ্যেমে বিদ্যালয় মূল্যায়ন করেন। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের কক্ষ সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, লাইব্রেরির বই সংখ্যা, এমনকি কোনো পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণেও স্কোর কার্ড ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রতিবেশীর ধরন, বাড়ির মালিকানার ধরন, ভবন, টিভি, ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কুলার, ফ্যান, পশুর সংখ্যা, হাঁস-মুরগির সংখ্যা, বাদ্য যন্ত্রের সংখ্যা, পিতার পেশা, পরিবারের অন্য সদস্যদের পেশা ও আয় ইত্যাদির মূল্যমান ধরে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণ করা সহজ।

৬. নমুনা স্কেল (The Specimen Scale)

সাধারণত বিজ্ঞানাগারে গবেষণায় নমুনা স্কেল ব্যবহার করা হয়। তবে আচরণগত গবেষণায়ও নমুনা স্কেলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কোনো ব্যক্তির বিশেষ কৃতিত্ব, গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের স্তর পর্যায়ের মূল্যায়ন করা হয়। এই কৌশলের উদ্ভাবক মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক। তিনি সর্বপ্রথম হাতের লেখার উপর একটি নমুনা স্কেল তৈরি করেন। তিনি মানুষের বিভিন্ন বয়স আর স্তরের বিপুল পরিমাণ হাতের লেখা সংগ্রহ করেন। তিনি হাতের লেখার উপর একটি আদর্শ মানও তৈরি করেন। এই আদর্শ মান হতে হাতের লেখার বিভিন্ন বয়সে ও স্তরে উন্নতি বা অবনতি মূল্যায়ন করেন।

বিজ্ঞানাগারে রসায়নের বিভিন্ন পরীক্ষায় নমুনা স্কেলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– একটি দ্রবণে এসিডের পরিমাণ নির্ধারণে p^H পরীক্ষা করা হয়। কোনো দ্রবণের বিভিন্ন প্রকারের রং, বিভিন্ন এসিডের পরিমাণ নির্দেশ করে। দ্রবণের এসিডের পরিমাণ কত তা এসিডের রং দেখেই নির্ণয় করা যায়।

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১. উপাত্ত কী? উপাত্তের চারটি উদাহরণ দিন।
২. উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৩. উপাত্ত কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।
৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের পার্থক্য করুন।
৫. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী? উদাহরণ দিন।
৬. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক কয়টি ও কী কী?
৭. গড়ের ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৮. গড়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৯. উদাহরণসহ গড়, মধ্যমা ও প্রচুরকের বর্ণনা দিন।
১০. মধ্যক বলতে কী বোঝায়? মধ্যক কেন ব্যবহার করা হয়?
১১. প্রচুরক কাকে বলে? প্রচুরকের ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
১২. গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রের ব্যাখ্যা দিন।
১৩. বিস্তার পরিমাপের ধারণার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।
১৪. বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
১৫. বিস্তার পরিমাপের শ্রেণিবিভাগ করুন।
১৬. আদর্শ বিচ্যুতি কী? উদাহরণ দিন।
১৭. আদর্শ বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
১৮. আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহারগুলো কী কী?
১৯. চতুর্থাংশ বিচ্যুতির ব্যবহার বর্ণনা করুন।
২০. সহ-সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? সহ-সম্পর্কের শ্রেণিবিভাগ করুন।
২১. সহ-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
২২. সহ-সম্পর্কের তাৎপর্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
২৩. সহ-সম্পর্কের ব্যবহার উল্লেখ করুন।
২৪. সহগাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র দুটি বিশ্লেষণ করুন।
২৫. স্বাভাবিক সম্ভাবনার বৈশিষ্ট্য কী কী?
২৬. স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র অংকন করে সিগমা (σ) লিমিট দেখান।
২৭. স্বাভাবিক সম্ভাবনার শিক্ষামূলক তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
২৮. রেটিং স্কেল কী? সংখ্যাভিত্তিক রেটিং স্কেলের বর্ণনা দিন।
২৯. উত্তম রেটিং স্কেলের শর্তাবলি উল্লেখ করুন।
৩০. চেক লিস্ট কী? উদাহরণ দিন।
৩১. বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করুন।

খ) রচনামূলক প্রশ্ন :

১. উপাত্ত বলতে কী বোঝায়? উপাত্তের শ্রেণিবিভাগ করে তার বর্ণনা দিন। শিক্ষা গবেষণায় উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য কী? গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তকে ব্যবহার উপযোগী করার কৌশল বা পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
৩. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী? কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।
৪. গড় কী? গড়ের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৫. গড়, মধ্যমা ও প্রচুরকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।

৬. নিম্নের বণ্টনটি থেকে গড় বের করুন

শ্রেণি ব্যবধান	৯০-৯৯	৮০-৮৯	৭০-৭৯	৬০-৬৯	৫০-৫৯	৪০-৪৯	৩০-৩৯	২০-২৯	১০-১৯
গণসংখ্যা	২	৪	৫	৯	১৪	১২	৯	৩	২

৭. নিম্নের বণ্টনটি থেকে মধ্যমা বের করুন।

শ্রেণি ব্যবধান	৯০-৯৫	৮৫-৯০	৮০-৮৫	৭৫-৮০	৭০-৭৫	৬৫-৭০	৬০-৬৫	৫৫-৬০	৫০-৫৫	৪৫-৫০
গণসংখ্যা	৩	৫	৭	১৩	১৫	১০	৭	৪	৪	২

৮. নিম্নের বণ্টনটি থেকে প্রচুরক বের করুন

শ্রেণি ব্যবধান	৭৫-৮০	৭০-৭৫	৬৫-৭০	৬০-৬৫	৫৫-৬০	৫০-৫৫	৪৫-৫০	৪০-৪৫	৩৫-৪০	৩০-৩৫
গণসংখ্যা	২	৪	৫	৯	১৪	১০	৯	৩	২	২

৯. নিম্নের বণ্টনটি থেকে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক বের করুন

শ্রেণি ব্যবধান	৯০-৯৫	৮৫-৯০	৮০-৮৫	৭৫-৮০	৭০-৭৫	৬৫-৭০	৬০-৬৫	৫৫-৬০	৫০-৫৫	৪৫- ৫০	৪০-৪৫
গণসংখ্যা	৩	৫	৭	১০	১২	৮	৬	৫	৪	৩	২

১০. আদর্শ বিচ্যুতি কী? আদর্শ বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।

১১. নিম্নলিখিত বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	৭০-৭৪	৬৫-৬৯	৬০-৬৪	৫৫-৫৯	৫০-৫৪	৪৫-৪৯	৪০-৪৪	৩৫-৩৯	৩০-৩৪
গণসংখ্যা	২	৩	৮	১১	১৫	৭	৭	৫	২

১২. নিম্নের বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	**গণসংখ্যা**
৯০—৯৯	১
৮০—৮৯	১০
৭০—৭৯	১২
৬০—৬৯	১৬
৫০—৫৯	১১
৪০—৪৯	৬
৩০—৩৯	৩
২০—২৯	১
	N= ৬০

১৩. নিম্নের বণ্টনটির চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণি ব্যবধান	৯১-১০০	৮১- ৯০	৭১-৮০	৬১-৭০	৫১-৬০	৪১-৫০	৩১-৪০	২১-৩০	১১-২০
গণসংখ্যা	২	২	৫	৫	৯	৬	৬	৩	২

১৪. সহ-সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? চিত্রসহ সহ-সম্পর্কের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

১৫. নিচে ১০ জন শিক্ষার্থীর দুটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো। এ উপাত্ত থেকে প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে সহগাঙ্ক নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শিক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বাংলা	৫০	৫৪	৫৬	৫৮	৬০	৬২	৬১	৬৫	৬৭	৭১
ইংরেজি	২২	২৫	৩৪	২৯	২৮	৩০	৩২	৩০	২৮	৩৪

১৬. নিম্নে ১২ জন ছাত্রের বাংলা ও গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো। সারি পার্থক্য পদ্ধতিতে সহগাঙ্ক নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

ছাত্র	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ
বাংলা	৪০	৪২	৫২	৬২	৬০	৫৮	৪০	৬০	৫২	৪০	৫১	৬০
গণিত	৫০	৪৮	৫০	৭০	৫৫	৫০	৩০	৫০	৪৫	৪০	৫২	৬৫

১৭. নিচে ১০ জন শিক্ষার্থীর দুটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো। এ উপাত্ত থেকে সহগাঙ্ক নির্ণয় করুন এবং ফলের ব্যাখ্যা দিন।

শিক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বাংলা	৭২	৫৮	৬৯	৮২	৬৩	৭৪	৭২	৮৫	৫৮	৬২
ইংরেজি	৬১	৫৫	৫৬	৫৮	৫২	৬৩	৬৪	৬১	৫৭	৬০

১৮. স্বাভাবিক সম্ভাবনা কী? স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র অংকন করে বিশ্লেষণ করুন। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষামূলক তাৎপর্য বা ব্যবহার উল্লেখ করুন।

১৯. রেটিং স্কেল কী? বিভিন্ন প্রকার রেটিং স্কেলের বর্ণনা দিন।

২০. সমাজমিতিমূলক কৌশলের উদাহরণসহ বর্ণনা দিন। এর নীতি ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. তপন, শাহজাহান ও মনিরা হোসেন, ১৯৯৮, শিক্ষা মূল্যায়ন, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. জামাল উদ্দিন এম, ১৯৯৮, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৩. জিনাত জামান, ১৯৮৭, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল, ঢাকা।
৪. ড. তপন, শাহজাহান, ১৯৯০, থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন, ঢাকা।
৫. মিঞা ও মিয়ান, ১৯৮৮, পরিসংখান পরিচিতি, ১৯৯৩, আইডিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা।
৬. ড. রায়, সুশীল, ১৯৯৫, মূল্যায়ন নীতি ও কৌশল, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
৭. ড. আমজাদ হোসেন, শেখ, ২০০৭, শিখন, মূল্য যাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা।
৮. ঘোষ, অরুন, ১৯৯৬, মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও পরিসংখ্যান, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলিকাতা।
৯. ঢালী, স্বপন কুমার, ২০১৩, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা।
১০. হোসেন, মো: জাকির, ২০০০, শিক্ষামূলক গবেষণা, মেট্রো পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
১১. আহামেদ, আলিম আল আইয়ুব, ২০০৫, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা।
১২. চৌধুরী, আবদুল হান্নান, ১৯৯২, পরিসংখানের মূলতত্ত্ব, প্রবাহ প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩. মজুমদার, মোঃ আবদুল আউয়াল ও মাহমুদ, কাজী আবুল, ১৯৯৮, ভূগোলে সংখ্যাতত্ত্ব, স্থানিক বিশ্লেষণ, সড়কজালি বিশ্লেষণ, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

ইউনিট-৭ : গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

যে কোনো গবেষণার প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয় গবেষণার বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মধ্য দিয়ে। ধারণা অর্জনের পর সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ করা হয়। সমস্যা নির্ধারণ হলো গবেষণার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা । গবেষণার বিষয়টির কোনো কোনো দিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কেন, কোনো দিক হতে সমস্যাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। গবেষণার জন্য বিষয় নির্ধারণ শেষ হলেই শুরু হয় গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুতের কাজ। গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে সাধারণভাবে বুঝায় গবেষণার পরিকল্পনা। অর্থাৎ গবেষণার প্রস্তাব হলো সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণা পরিচালনা করার একটি কর্মসূচি বা পরিকল্পনা। প্রতিটি গবেষণা শুরু হয় একটি সমস্যা বা উদ্দেশ্য দিয়ে। গবেষণা প্রস্তাবের প্রকৃতি গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে গবেষণা যে উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হোক না কেন, এটি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন গবেষণা প্রস্তাবনা। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও যথাযথ পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াকে গবেষণা প্রস্তাবনা বলা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গবেষক কিভাবে তার গবেষণা পরিচালনা করবেন, কোনো পর্যায়ে কি কাজ করবেন তার সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং দিক নির্দেশনা থাকবে গবেষণা প্রস্তাবে। গবেষণার জন্য প্রাপ্ত অর্থ, সময় ও শ্রমকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্যই গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করবেন এবং কীভাবে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবেন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে পূর্ব থেকেই গবেষককে তার পরিকল্পনা মধ্যে রাখতে হবে এবং বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে তার গবেষণার প্রস্তাবনায় উপস্থাপন করতে হবে। একটি সুষ্ঠু গবেষণা প্রস্তাবের উপর একটি সার্থক গবেষণা নির্ভরশীল। গবেষণা প্রস্তাব অনুযায়ী গবেষক তার গবেষণার কাজে অগ্রসর হন ও গবেষণা কাজকে পরিচালিত করেন। এ ইউনিটে কীভাবে গবেষণার ধারণা লাভ করা যায়, ধারণা অর্জনের পর গবেষণার সমস্যা সনাক্তকরণ, গবেষণার প্রস্তাবনার কাঠামো এবং গবেষণা প্রস্তাবনার ইত্যাদি বিষয়গুলো কীভাবে করা যায় সেসম্পর্কে আলোচনা করা হবে। নিম্নে ইউনিট-৭-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শিরোনাম দেওয়া হলো।

৭.১: গবেষণা প্রস্তাবনার ধারণা, সমস্যা সনাক্তকরণ
৭.২: গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো
৭.৩: গবেষণা প্রস্তাবনারপ্রণয়ন, গবেষণায় নৈতিকতা

৭.১ : গবেষণা প্রস্তাবনার ধারণা ও সমস্যা সনাক্তকরণ (Concepts of Research Proposal and Problem Identification)

যে কোনো গবেষণা শুরু হয় গবেষণা প্রস্তাবনা নিয়ে। অর্থাৎ গবেষণা শুরু করার পূর্বেই গবেষককে কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করতে হয় যেটি নিয়ে তিনি গবেষণার কাজটি করতে চান। যে কোনো গবেষণার জন্য বিষয় নির্বাচন করা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এই ধাপটি সম্ভবত গবেষণার সবচেয়ে কঠিন কাজ। কঠিন কথাটি বলা হচ্ছে এজন্য যে, গবেষক যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণার জন্য কোনো বিষয় ঠিক করতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত গবেষণার কাজটি শুরু করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ গবেষক কী বিষয়ে গবেষণা করতে চাচ্ছেন সে বিষয়টি নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে গবেষণা পরিচলনার পরিকল্পনা করা তার জন্য কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণার জন্য কোনো বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ ও তার উপর ভিত্তি করে গবেষণার প্রস্তাবনা গঠন করা যে কোনো গবেষণার পূর্বশর্ত। এ ব্যাপারে গবেষকদের অভিমত হলো, গবেষণার বিষয় বা প্রস্তাবনা গঠন এবং সুস্পষ্টকরণ হলো কোনো গবেষণার সূচনা বা প্রারম্ভিক ধাপ (Ghauri *et. al*, ১৯৯৫, Smith and Dainty, ১৯৯১)। গবেষণার প্রস্তাবনা কী হবে সে সম্পর্কে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান থাকতে হবে। গবেষণার প্রস্তাব নির্ধারণ হয়ে গেলে তা গবেষককে গবেষণার পরিচালনার জন্য সঠিক গবেষণা কৌশল, উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়তা করে। গবেষণা প্রস্তাবনা গঠন এবং সুস্পষ্টকরণের প্রারম্ভিক ধাপগুলোতে গবেষক গবেষণার প্রস্তাব নির্বাচন, গবেষণা সংক্রান্ত সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review) করার মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তন করা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং পরিশেষে, একটি সহজে পরিচালনাযোগ্য (feasible) গবেষণা সমস্যা নির্বাচন করেন। এ পর্যায়টি সম্পন্ন হওয়ার পরই গবেষক তার গবেষণার প্রশ্ন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে গবেষণার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেন।

গবেষণা প্রস্তাবনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরির ক্ষেত্রে গবেষককে কতকগুলো বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে গবেষক গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করলে আশা করা যায় এটি একটি গ্রহণযোগ্য এবং গবেষণাযোগ্যপ্রস্তাবনা তৈরি হবে।

গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরির জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে গবেষক লক্ষ্য রাখবেন সেগুলো (Saunders,et al., ২০০০ পৃঃ ১৫) হলো–

- বিষয়টি গবেষকের আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ?
- গবেষণার বিষয়টি গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ?
- গবেষণার বিষয়টিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা যা গবেষণার তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?
- গৃহীত সময়সীমার মধ্যে গবেষণাটি সম্পন্ন করার দক্ষতা গবেষকের রয়েছে কিনা ?
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব কিনা ?
- গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা স্থানের অনুমতি অর্জনে গবেষক যোগ্য কিনা ?
- গবেষণা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্যে রেখে গবেষণার প্রশ্ন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণে গবেষক যোগ্য কিনা ?
- প্রস্তাবিত গবেষণাটি বিষয় সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে কিনা ?
- যে বিষয়ে গবেষক গবেষণা করতে ইচ্ছুক, গবেষণা প্রস্তাবনাটি তার সাথে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত কিনা ?
- নির্বাচিত গবেষণার বিষয়টি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিসম (symmetrical) কিনা ? অর্থাৎ ফলাফল যাই হোক না কেন তা গবেষণার বিষয়টির মতো মূল্যবান কিনা ?

গবেষণা প্রস্তাবনা গঠন (Formulation of Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাবনা বিভিন্ন উপায়ে গঠন করা যায়। একটি হতে পারে যৌক্তিক চিন্তনের (Rational thinking) মাধ্যমে এবং অন্যটি হতে পারে সৃজনশীল চিন্তনের(creative thinking) মাধ্যমে। যৌক্তিক চিন্তা এবং সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে একজন গবেষক যেভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা গঠন এবং তা পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তন করতে পারেন তার মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা নিচের টেবিলে দেওয়া হলো।

যৌক্তিক চিন্তন	সৃজনশীল চিন্তন
● নিজের যোগ্যতা বা ক্ষমতা এবং আগ্রহের পরীক্ষা করা ● অতীতের গবেষণাগুলো দেখা ও আলোচনা করা ● গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা করা	● গবেষণার ধারণা সংগ্রহের জন্য নোট বই সংরক্ষণ ● পূর্বের গবেষণা ও নিজের কাজের পর্যালোচনা করা ● ব্যক্তিগত পছন্দের অনুসন্ধান ওRelevance treesওমাথা খাটানো

[**উৎস :** Saunders, *et al.*, ২০০০ঃ পৃ. ১৬]

নিজের ক্ষমতা ও আগ্রহের পরীক্ষা

এক্ষেত্রে গবেষণা করার জন্য গবেষক এমন একটি বিষয় নির্বাচন করতে পারেন যা নিয়ে গবেষণা করলে তিনি ভালো করবেন। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে তাহলো, গবেষক যে বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বে কাজ করেছেন সেগুলো দেখা। পূর্বের কাজ থেকে নতুন কোনো কিছু অনুসন্ধান করা যেতে পারে যে বিষয়টিতে গবেষকের আগ্রহ রয়েছে। যেমন– গবেষক হয়ত “ শিক্ষকদের পেশাগত সন্তুষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। পরে তার নিজের কাজ থেকে আরো কিছু নতুন তথ্য অনুসন্ধান করতে চান। তাই পরবর্তীতে “ শিক্ষকদের পেশাগত সন্তুষ্টি এবং মানসিক স্বাস্থ্য ” নিয়ে কোনো কাজ করতে আগ্রহী হতে পারেন।

পূর্বের গবেষণার শিরোনামগুলো দেখা (Review of Previous Research Titles)

গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী সে বিষয়ে পূর্বে যেসব গবেষণা হয়েছে সেসব গবেষণার শিরোনামগুলো দেখে তার গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন করে প্রস্তাব প্রস্তুত করতে পারেন।

পূর্বের গবেষণা পর্যালোচনা করে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসন্ধান করা

গবেষণার প্রস্তাব নির্বাচনের জন্য আরেকটি পন্থা হলো পূর্বের গবেষণা পর্যালোচনা করে সেখান থেকে নিজের পছন্দের গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন করে প্রস্তাবনা নির্বাচন করা।

আলোচনা করা (Discussion)

অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করেও গবেষণার ক্ষেত্র ও প্রস্তাবনা নির্বাচন করা যেতে পারে, যেমন– গবেষক এবং পেশাগত দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার ধারণা লাভ করা যেতে পারে (Gill এবং Johnson, ১৯৯৭)। বন্ধু, সহকর্মী, কোর্স টিউটরও হতে পারেন গবেষণার ক্ষেত্র ও শিরোনাম নির্বাচনের একটি ভালো উৎস।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান তার সংক্ষিপ্ত সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review) করে গবেষণার প্রস্তাব গঠন করতে পারেন। গবেষণার ধারণা গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে– (১) একাডেমিক এবং পেশাগত জার্নালের প্রবন্ধ; (২) প্রতিবেদন রিপোর্ট এবং (৩) গ্রন্থমালা (Sharp এবং Howard ১৯৯৬)।

নোট বই সংরক্ষণ (Preservation of Notebook)

গবেষণার ধারণা বা প্রস্তাবনা গঠনের একটি উত্তম পন্থা হলো নোটবই সংরক্ষণ করা। এই নোট বইয়ে গবেষক তার আগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে বা শিরোনাম লিখে রাখতে পারেন। এছাড়া গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাগুলো তিনি নোট বই-এ সংরক্ষণ করতে পারেন। তার গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন তিনি সেখানে লিখে রাখতে পারেন, যেমন- গবেষণাটি কী উদ্দেশ্য করতে চান? গবেষণা থেকে তিনি কী ধরনের ফলাফল প্রত্যাশা করছেন? এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কোনো তথ্য যোগ করতে পারবে কী না? কী কৌশলে উপাত্ত সংগ্রহ করা যাবে? গবেষণাটি সহজে পরিচালনাযোগ্য (feasible) কী না? ইত্যাদি। এসব চিন্তাগুলোর মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণার ধারণাকে আরো সুনির্দিষ্ট এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন।

মাথা খাটানো (Brainstorming)

মাথা খাটানো বা সমস্যা সমাধানের কৌশলটি গবেষণা প্রস্তাবনার ধারণা গঠন বা পরিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। এই কৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (Moody, ১৯৮৩, Saunders et.al, ২০০০ঃ পৃঃ ১৯-২৩ উদ্ধৃত)।

- গবেষকের আগ্রহ রয়েছে সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার সমস্যা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ।
- সমস্যার সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য মতামত জানার চেষ্টা করা। মতামতগুলো নিম্নের নীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা-
    - সকল ধারণা সংগ্রহের পূর্বে কোনো মতামতের সমালোচনা বা মূল্যায়ন না করা।
    - সকল মতামত তা যতই নগন্য বা অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন তা লিপিবদ্ধ বা বিবেচনা করা।
- যত বেশি সম্ভব মতামত লিপিবদ্ধ করা।
- সকল মতামত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে তা পর্যালোচনা ও আলোচনা করা।
- সবগুলো মতামত বিশ্লেষণ করে কোনোটি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং কেন- তা নির্ধারণ করা।

Relevance trees

এই কৌশলটিও গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। Relevance trees-এর ব্যবহার পদ্ধতি অনেকটা ধারণা মানচিত্র (mind mapping)-এর সদৃশ্য (Buzan with Buzan, ১৯৯৫)। এখানে গবেষক একটি বড় পরিসরের ধারণা দিয়ে তার গবেষণার ধারণার সূচনা করেন এবং তা থেকে সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করে থাকেন। এখানে গবেষক প্রতিটি বিষয়ের পৃথক শাখা গঠন করেন এবং এ থেকে আরো উপশাখা গঠন করেন। গবেষক যত বেশি উপশাখা গঠন করতে পারবেন তিনি তত বেশি ব্যাপক ধারণা বের করতে পারবেন।

গবেষণার সমস্যা সনাক্তকরণ /চিহ্নিতকরণ

যে কোনো গবেষণার শুরু হয় একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক গবেষণার যে বিষয়টি চিহ্নিত করেন বা নির্ধারণ করেন তাই গবেষণা সমস্যা। গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষক উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমস্যা চিহ্নিত করার পর তা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গবেষক তার গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। গবেষক তার সমস্যার ভিত্তিতে গৃহীত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণার ফলাফল নির্ণয় করেন। সমস্যা সনাক্তকরণ বলতে বুঝায় গবেষণার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট,

সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা। তাহলে বুঝা গেল যে, গবেষণা পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হলো গবেষণার সমস্যা নির্বাচন বা সনাক্তকরণ। প্রাত্যহিক জীবনে সমাজে চলার পথে আমরা বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। এসব সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করে আমরা গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করতে পারি। তবে আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটনার সবগুলোই গবেষণার উপযোগী নয়। অর্থাৎ যে কোনো সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা যায় না। তবে গবেষক তার গবেষণার জন্য যে বিষয়টি নির্বাচন করবেন তার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক :

- যে বিষয়টি নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে তা পরিহার করতে হবে।
- একজন নতুন বা মধ্যমমানের গবেষক চেষ্টা করবেন কোনো বিতর্কিত বা জটিল বিষয়ে গবেষণা না করা।
- যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আশা করা যায় তা নির্বাচন করা। খুব সংকীর্ণ বা অস্পষ্ট সমস্যা নির্বাচন পরিহার করা।
- নির্বাচিত সমস্যাটি পরিচিত এবং সহজে পরিচালনাযোগ্য (feasible) হতে হবে যাতে করে গবেষণার উপাত্ত সহজে সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে গবেষক তার গবেষণার সমস্যা সনাক্তকরণের জন্য কোনো অভিজ্ঞ গবেষক বা বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- গবেষণার সনাক্তকরণ বা নির্বাচনের সময় বিষয়ের গুরুত্ব, গবেষকের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণা ব্যয়, সময় এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- সমস্যা বা বিষয়টি গবেষণার যোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ সমস্যাটি এমন হবে যাকে বিশ্লেষণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হবে।
- সমস্যাটি পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

সুতরাং গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষণার সমস্যা খুব সচেতনতার সাথে সনাক্তকরণ ও নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা ধারণা লাভ ও সমস্যা নির্বাচনের পর গবেষক তার নির্বাচিত গবেষণা সমস্যাটিকে মাথায় রেখে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবেন। গবেষণার সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি গবেষক উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা না করেন সেটা হবে শুধু পণ্ডশ্রম। তাই গবেষণাকে সার্থক করার জন্য গবেষক উপরের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৭.২ : গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো (Format of Research Proposal)

গবেষণার জন্য বিষয় নির্ধারণ শেষ হলে গবেষণার জন্য কোনো ধরনের তথ্যের প্রয়োজন বা কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা অনুমান করা যায়। এই অনুমানের ভিত্তিতে গবেষক গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে থাকেন। গবেষণা প্রস্তাব হলো গবেষণার পরিকল্পনা। অর্থাৎ গবেষণার বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণা পরিচালনা করার কর্মসূচী বা পরিকল্পনাই হলো গবেষণা প্রস্তাব। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সঠিক ও যথাযথ পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ গবেষণা প্রস্তাব। Furseth and Everett (২০১৩: পৃ. ১১)- এর মতে,æA research proposal is a plan for your work … It is a map that outlines what you want to do, why you want to do it, how you want to do it, what you expect to find, and a plan that shows your ability to deliver what you promise". গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা চিহ্নিত করার পর সেটি পরিচালনার জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হলো একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা নক্সা (Design) প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনা বা নক্সাকে সামনে রেখে গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যার মধ্যে গবেষণার প্রস্তাবে গবেষণার জন্য গৃহীত সমস্যার যাবতীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। এতে, পুনরাবৃত্তি, অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ সম্ভব হয়। অতএব, গবেষণার প্রস্তাবপত্র হচ্ছে কর্ম শক্তির অপচয়, অন্য গবেষণার পুনরাবৃত্তি ও নকল এড়ানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা (আহামেদ, ২০০৫: পৃ.)। গবেষণার প্রস্তাবকে নীল নক্সা বলা যেতে পারে, যা দেখে গবেষক ধাপে ধাপে তার গবেষণা পরিচালনা করেন। সহজ কথায় বলা যায়, পূর্ব থেকেই গবেষণা পরিচালনার যে খসড়া বা পূর্ব পরিকল্পনা গবেষক তৈরি করেন তাকেই গবেষণার প্রস্তাব বলে। এই প্রস্তাবে সমস্যা বা উদ্দেশ্য নিয়ে কোথায়, কখন, কাদের উপর এবং কী পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে গবেষণাটি করা হবে এসকল যাবতীয় সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। গবেষণার জন্য কিভাবে পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় পরিমিত ব্যয়ে ও সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায় তাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। বস্তুত গবেষণা প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় (আহামেদ, ২০০৫: পৃ.):

- কি বিষয়ে গবেষণাটি করা হবে;
- কি উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হবে;

- কোথায় বা কোনো এলাকায় গবেষণাটি পরিচালিত হবে;
- কি ধরনের উপাত্তের দরকার হবে;
- প্রয়োজনীয় উপাত্ত কোথায় পাওয়া যাবে;
- কতটা সময় ধরে গবেষণা করা হবে;
- কিসের ভিত্তিতে একক নির্বাচন করা হবে;
- উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কী কী কৌশল ব্যবহৃত হবে;
- নমুনা নক্সা কেমন হবে এবং
- প্রতিবেদন প্রস্তুতের ধরন কেমন হবে।

গবেষণা প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে গবেষণা প্রস্তাব লিখাতে হয় হয়। সাধারণভাবে একটি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য যে কাঠামোটি অনুসরণ করা হয় তা হলো নিম্নরূপ।

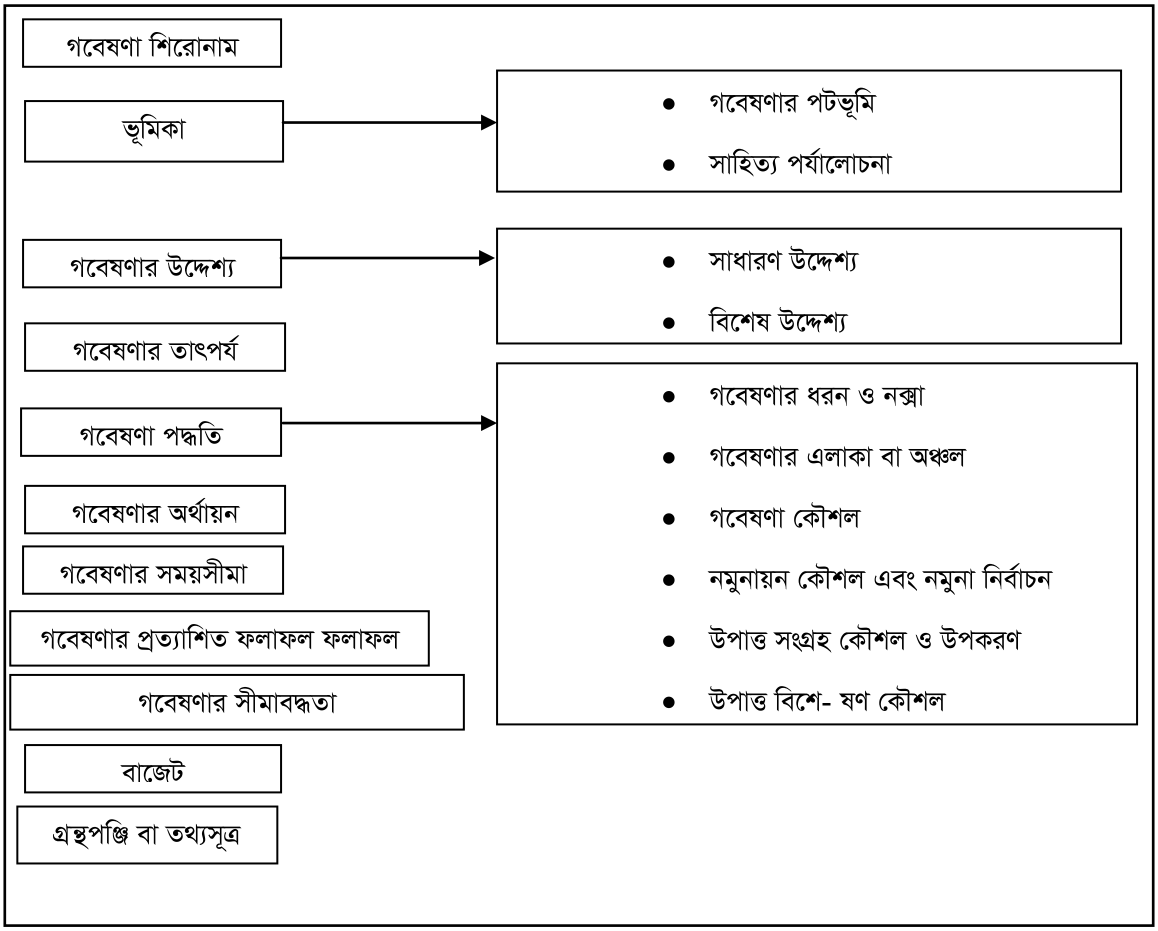
গবেষণা শিরোনাম
ভূমিকা
গবেষণার পটভূমি
সাহিত্য পর্যালোচনা
গবেষণার উদ্দেশ্য
সাধারণ উদ্দেশ্য
বিশেষ উদ্দেশ্য
গবেষণার তাৎপর্য
গবেষণা পদ্ধতি
গবেষণার ধরন ও নক্সা
গবেষণার এলাকা বা অঞ্চল
গবেষণা কৌশল
নমুনায়ন কৌশল এবং নমুনা নির্বাচন
উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল ও উপকরণ
উপাত্ত বিশে- ষণ কৌশল
গবেষণার অর্থায়ন
গবেষণার সময়সীমা
গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল ফলাফল
গবেষণার সীমাবদ্ধতা
বাজেট
গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যসূত্র

চিত্র-১ : গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো

গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামোটি নির্ভর করবে গবেষক তার গবেষণায় কোনো ধরনের গবেষণা কৌশল (approach) ব্যবহার করছেন তার উপর। গবেষক যদি সম্পূর্ণরূপে গুণগত (Qualitative) গবেষণা কৌশল অবলম্বন করতে চান সেক্ষেত্রে তিনি Creswell (২০০৭: পৃ. ৪৭-৪৮) প্রদত্ত নিচের কাঠামো অনুসরণ করতে পারেন।

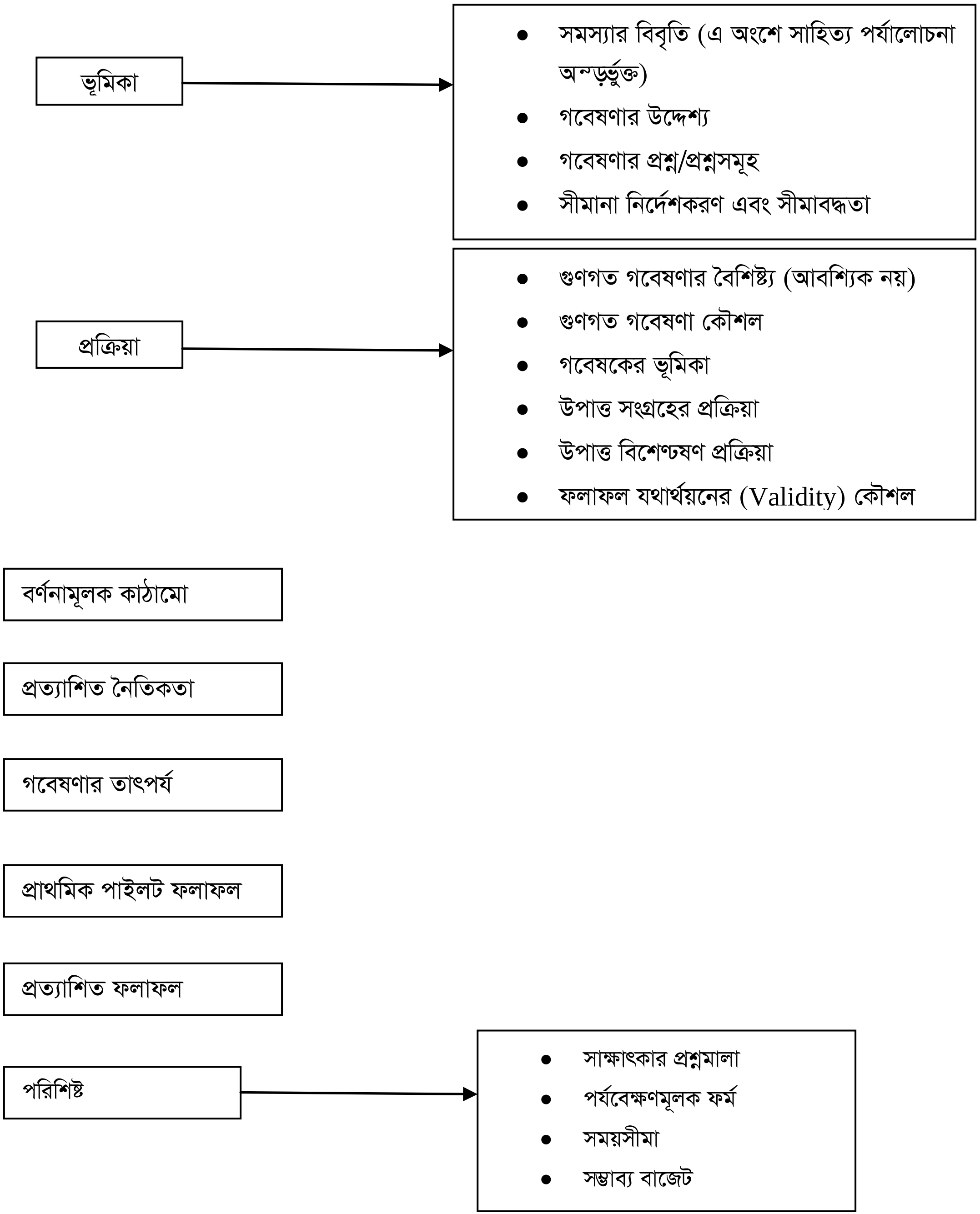
ভূমিকা
সমস্যার বিবৃতি (এ অংশে সাহিত্য পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত)
গবেষণার উদ্দেশ্য
গবেষণার প্রশ্ন/প্রশ্নসমূহ
সীমানা নির্দেশকরণ এবং সীমাবদ্ধতা
প্রক্রিয়া
গুণগত গবেষণার বৈশিষ্ট্য (আবশ্যিক নয়)
গুণগত গবেষণা কৌশল
গবেষকের ভূমিকা
উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া
উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া
ফলাফল যথার্থয়নের (Validity) কৌশল
বর্ণনামূলক কাঠামো
প্রত্যাশিত নৈতিকতা
গবেষণার তাৎপর্য
প্রাথমিক পাইলট ফলাফল
প্রত্যাশিত ফলাফল
পরিশিষ্ট
সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা
পর্যবেক্ষণমূলক ফর্ম
সময়সীমা
সম্ভাব্য বাজেট

চিত্র-২ ঃ গুণগতগবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো

সাধারণভাবে গবেষণা কর্মের সুনির্দিষ্ট ধাপগুলো হলো সমস্যা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন। তবে গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী এর কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। গুণগত (Qualitative) গবেষণার মতো কর্ম সহায়ক গবেষণায়ও অনুরূপ ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে কর্মসহায়ক গবেষণা অন্যান্য গবেষণা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন বিধায় এখানে পরে প্রস্তাবনার ধাপে কিছুটা ভিন্নতা থাকে। কর্মসহায়ক গবেষণার একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান করা, পক্ষান্তরে অন্যান্য গবেষণার লক্ষ্য হলো গবেষণার জন্য গৃহীত সমস্যার সত্য উদঘাটন করা। সে কারণে কর্মসহায়ক গবেষণায় জন্য অনুসরণীয় ধাপসমূহে অতিরিক্ত অংশটি হলো সমাধানের সুচিন্তিত ও অর্জনযোগ্য ধাপ। কর্ম সহায়ক গবেষণার জন্য যে বিশেষ অংশটি সংযোজিত হয় তা নিম্নরূপ।

সারণি-৩ : কর্মসহায়ক গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো

প্রথম চক্র	
• ১ম ধাপ	• সমস্যা চিহ্নিতকরণ
• ২য় ধাপ	• সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান
• ৩য় ধাপ	• সম্ভাব্য সমাধানের উপায় পরিকল্পনাকরণ
• ৪র্থ ধাপ	• কার্য সম্পাদন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ
• ৫ম ধাপ	• প্রতিফলন
দ্বিতীয় চক্র	
• ১ম ধাপ	• পুনঃচিহ্নিত সমস্যা
• ২য় ধাপ	• সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান
• ৩য় ধাপ	• সম্ভাব্য সমাধানের উপায় পরিকল্পনাকরণ
• ৪র্থ ধাপ	• কার্য সম্পাদন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ
• ৫ম ধাপ	• প্রতিফলন

[**উৎস**:হোসেন এবং সহযোগী গবেষকগণ, ২০০৯: পৃ. ৬৯-৭০]

সাম্প্রতিককালে গবেষণার যে ধরনটি গবেষকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তা হলো কর্মসহায়ক গবেষণা। কর্মসহায়ক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সত্য উদঘাটন এবং অবস্থার উন্নয়ন বা পরিবর্তন। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় বা উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত না হয় ততক্ষণ পর্যায়ক্রমিক চক্রে এই গবেষণা চলতে থাকে । কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত (সারণি-৩) প্রস্তাবনা কাঠামো অনুসরণ করা হয় চারটি ধাপেরই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তবে এখানে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা হলো প্রতিবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। প্রতিটি চক্র শুরু হবে পুনঃচিহ্নিত নতুন সমস্যা দিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটি চক্রাকারে নতুন নতুন সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াসহ অগ্রসর হয়। আর এ ধরনের চক্রাকার পর্যায়কে বলা হয় গবেষণার সর্পিল প্রকৃতি। কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য যে স্পাইরাল কাঠামোটি অনুস্বরূপ করা যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

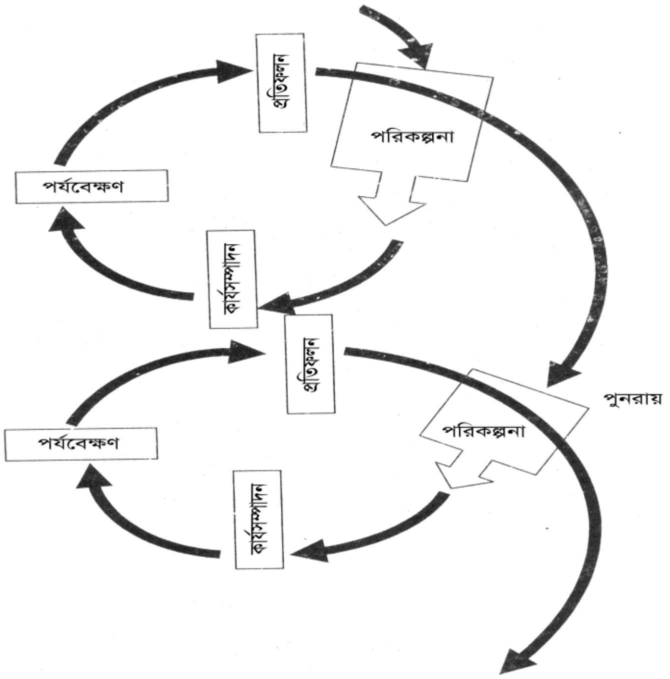

চিত্র-৩ : কর্মসহায়ক গবেষণার স্পাইরাল চিত্র [**উৎস** : হোসেন এবং সহযোগী গবেষকগণ, ২০০৯: পৃ. ৭১]

সবশেষে বলা যায় যে, গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal) হলো গবেষণা পরিচালনার জন্য পরিকল্পিত গবেষণা নক্সা, যা গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষককে গবেষণা সীমানা নির্ধারণ করে দেয় এবং গবেষককে উক্ত নির্ধারিত সীমানার মধ্যে তার গবেষণা পরিচালনা করতে হয়।

৭.৩ : গবেষণা প্রস্তাবনাপ্রণয়ন ও গবেষণায় নৈতিকতা

যে কোনো গবেষণা শুরু হয় গবেষণা প্রস্তাব নিয়ে। প্রতিটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষককে গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের গবেষক কিভাবে অগ্রসর হবেন, কোনো পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবেন, কাদের নিয়ে গবেষণাটি করবেন অর্থাৎ গবেষণার নমুনা বা সংগ্রহকারী কারা হবেন, কোনো নমুনায়ন কৌশল ব্যবহার করবেন, কী কৌশল ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করবেন ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা থাকবে গবেষণা প্রস্তাবনায়। একটি সুষ্ঠু গবেষণা প্রস্তাবনার উপর নির্ভর করে গবেষক কতটা সফলভাবে তার গবেষণাটি পরিচালনা করবেন। একজন গবেষক প্রকৃত গবেষণা পরিচালনার পূর্বেই তার গবেষণা সমস্যার সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত গবেষণা নক্সা নির্বাচন করে থাকেন। একটি গবেষণা প্রস্তাবের অংশগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

গবেষণা শিরোনাম (Title of the Study)

গবেষণার বিষয় নির্ধারণের পর গবেষকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে গবেষণাটির জন্য একটি শিরোনাম ঠিক করা। গবেষণার শিরোনামটি যেন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এতে করে সহজেই বুঝা যাবে যে, গবেষক আসলে কী নিয়ে বা উদ্দেশ্যে গবেষণা করতে চাচ্ছেন বা গবেষণার মাধ্যমে তিনি কী নিরুপণ করতে চাচ্ছেন। অনেক সময় গবেষণার শিরোনাম অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এতে করে গবেষণার তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা গবেষকের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে গবেষককে তার গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে।

গবেষণা শিরোনাম : শিক্ষার্থীর কৃতিত্বে শিক্ষকের প্রভাব নিরূপন

গবেষণার পটভূমি (Background of the Study)

দ্বিতীয় ধাপে যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা হবে সে বিষয়টি নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। এই তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে গবেষকের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পাবে। গবেষক কেন গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে বিষয়ে পটভূমির পরিশেষে উল্লেখ করতে হবে।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

এ পর্যায়ে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করতে হবে। এই সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষককে তার গবেষণার ধারণাগত কাঠামো (Conceptual framework) অনুধাবন করতে সহায়তা করে। গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান সে বিষয়ের পূর্বের গবেষণা, জার্নাল, বই বা পত্র-পত্রিকা থেকে গবেষণা পরিচালনার পদ্ধতি, ফলাফল, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান লাভ করতে পারেন। গবেষক তার গবেষণার পূর্বের গবেষণার সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করবেন। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য থাকলে তাও তিনি গবেষণা প্রস্তাবে উল্লেখ করতে পারেন। উপস্থাপিত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে বুঝা যাবে গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে গবেষক কতটুকু জ্ঞান রাখেন এবং কতটা যৌক্তিকভাবে গবেষক তথ্যগুলো তার গবেষণার জন্য উপস্থাপন করতে পারছেন।

সমস্যার বিবৃতি (Statement of the Problem)

এ ধাপে গবেষক তার গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। সমস্যাটি গবেষক বিবৃতি আকারে বা ছোট প্রশ্নাকারে উপস্থাপন করতে পারেন। এ থেকে গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

সমস্যার বিবৃতি : আলোচ্য গবেষণাটির সমস্যা হলো মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বে শিক্ষক কী ধরনের প্রভাব ফেলেন তা নিরূপণ।

প্রকল্প গঠন (Formation of hypothesis)

যে বিষয় বা যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণাটি করা হয় তার সম্ভাব্য সমাধান বা ফলাফলকে বলা হয় অনুমিতসিদ্ধান্ত বা গবেষণার প্রকল্প। আনুমানিক সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ও জানা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে যাতে তা সহজেই যাচাই করা সম্ভব হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

এ পর্যায়ে কী উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হচ্ছে তা বর্ণনা করতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা :

- সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objectives) এবং
- বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Specific Objectives)

সাধারণ উদ্দেশ্য : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের উপর শিক্ষকের প্রভাব নিরূপণ।

বিশেষ উদ্দেশ্য :

- শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য (যেমন– বয়স, জেন্ডার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ইত্যাদি) দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় তা নিরূপণ করা।
- শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বকে কতটা প্রভাবিত করে তা যাচাই করা।
- শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের উপর শিক্ষকের ব্যবহৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রভাব যাচাই করা।

গবেষণাটি কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে সেটি হলো সাধারণ উদ্দেশ্য। এটিকে প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্যও বলা হয়। সাধারণ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ছোট ছোট অনেকগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গঠন করতে হয়। এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণার মাধ্যমে কী পরিমাপ করতে চাচ্ছে তা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

গবেষণার যৌক্তিকতা বা তাৎপর্য (Rationale or Significance of the study)

এ পর্যায়ে গবেষণাটি কী কাজে লাগবে অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব উপস্থাপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, গবেষক যদি- শিখন শেখানো পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষণা করতে ইচ্ছুক হন সেক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল শিখন শেখানো পদ্ধতি ও শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে তা যুক্তিযুক্তভাবে উল্লেখ করতে হবে।

গবেষণার পরিসর (Scope of the Study)

এ পর্যায়ে গবেষণাটি কাদের উপর করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কারা এবং কীভাবে উপকৃত হবে সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দের কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান (Operational Definitions of the terms)

গবেষণার ব্যবহৃত বিশেষ কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত হলে তা কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। যেমন– "শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের উপর পুষ্টিকর খাবারে প্রভাব নির্ণয় শীর্ষক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক কৃতিত্ব, পুষ্টিকর খাবার বলতে কী বুঝায় তা সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন বা বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয় তার গবেষণাকে বিঘ্নিত করতে পারে। যেগুলো সম্পর্কে গবেষক পূর্বে হতে অনুমান করতে পারেন না। তাছাড়া কোনো গবেষকের পক্ষে পুরো সমগ্রক (population) নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয় বলে সমগ্রকের একটি প্রতিনিধিত্বমুলক অংশ নিয়ে গবেষণা করতে হয়। এক্ষেত্রে গবেষক একটি ছোট অংশ নিয়ে কেন কাজ করছেন এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা, যেমন– আর্থিক এবং সময় সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কেও বর্ণনা করবেন। এখানে অসুবিধাগুলো উল্লেখসহ তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বা পন্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রয়োজন।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে গবেষণার ধরন ও নক্সা। এখানে গবেষক কোনো ধরনের গবেষণা করছেন, অর্থাৎ বর্ণনামূলক, মূল্যায়নমূলক, ব্যাখ্যামূলক বা অনুসন্ধানমূলক– তা ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়া গবেষণা কৌশল (যেমন– গুণগত বা পরিমাণগত গবেষণা) এবং পদ্ধতি (যেমন–জরিপ, পরীক্ষণ, কার্যকরণ সম্পর্কিত গবেষণা) ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। গবেষণার তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের উপায়ও বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা-ইত্যাদি পদ্ধতির কোনো একটি বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করলে তা বর্ণনা করবেন এবং এসব পদ্ধতি কেন ব্যবহার করছেন তাও ব্যাখ্যা করবেন। তারপর গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নমুনার কৌশল এবং নমুনা (Sample) সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। পরিশেষে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে ফলাফল লাভের জন্য কোনো ধরনের কৌশল ব্যবহার করবেন সেটিও ব্যাখ্যা করবেন। অর্থাৎ পরিমাণগত (Quantitative) কৌশল, যেমন- পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ হলে কোনো কোনো কৌশল ব্যবহার করবেন তার বর্ণনা এবং কেন এসব কৌশল ব্যবহার করবেন তার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। গবেষক যদি গুণগত (Qualitative) কৌশল ব্যবহার করেন তবে এখানে কোনো ধরনের বিশ্লেষণ করবেন তার ব্যাখ্যা, আলোচনা বা পর্যালোচনা করবেন। অনেক সময় গবেষক উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের Software (যেমন– SPSS, STATA, MLWin, AMOS, NVivo ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত Software মাধ্যমে কী ধরনের বিশ্লেষণ তিনি করতে চান তার ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণার নৈতিকতা গবেষক কীভাবে অক্ষুণ্ন রাখবেন তার ব্যাখ্যাও এ পর্যায়ে বর্ণনা করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ অংশে তথ্যের উৎস থেকে শুরু করে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত গবেষণা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণার সময়সূচী (Time Frame of the Study)

একটি গবেষণা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন সময়সূচী। গবেষণার কাজ ধারাবাহিক ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য গবেষককে একটি সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ গবেষণাটি সম্পন্ন করতে কতদিন লাগবে তার উল্লেখ গবেষণা প্রস্তাবে থাকবে । কোনো অংশের জন্য কতদিন সময় লাগবে তার তালিকা তৈরি করে গবেষণার প্রস্তাবে উপস্থাপন করতে হয়। নিম্নে এরূপ একটি গবেষণার সময়সূচী নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

গবেষণার অনুমিত সময়সূচি

ক্রম.নং	কার্যক্রম	গবেষণা পরিচালনার সময়সীমা
১.	চুক্তি সম্পাদন	গবেষণা প্রজেক্ট প্রাপ্তির সময় হতে ১দিন
২.	Inception প্রতিবেদন দাখিল	প্রজেক্ট প্রাপ্তির ১ সপ্তাহ পর= ৭ দিন
৩.	সমীক্ষার উপকরণ (Tools) প্রণয়ন ও অর্থদাতা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন গ্রহণ	১০ দিন
৪.	নমুনা ভিজিট করে PRA প্রণয়ন	২ দিন
৫.	সমীক্ষার উপকরণের প্রাক্ মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণ	২ দিন
৬.	উপাত্ত সংগ্রকারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ	১ দিন
৭.	মাঠে লক্ষ্যদলের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ	৭ দিন
৮.	উপাত্ত সংরক্ষণকরণ, সারণিকরণ ও বিশ্লেষণ	১০ দিন
৯.	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	১০ দিন
১০.	গবেষণার অর্থদাতা প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য	১০ দিন
১১.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	অর্থদাতা প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য পাওয়ার পর হতে পরবর্তী ১০ দিন

গবেষণার প্রাক্কলিত বাজেট (Estimated Budget of the Study)

কোনো গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বা বাজেটের। বাজেটের আকার নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতির উপর। হিসাব থেকে কি পরিমাণ অর্থ গবেষণার জন্য ব্যয় হতে পারে তার অনুমিত বাজেট গবেষণার প্রস্তাবপত্রে বর্ণনা করতে হবে। কোনো খাতে কত সম্ভব্য ব্যয় হবেতার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পাওয়া যায় গবেষণা প্রস্তাবের এই বাজেট অংশ থেকে।

সম্ভাব্য প্রাক্কলিত আর্থিক সংশ্লেষ

	প্রস্তাবিত সম্মানী	মোট
ক) গবেষণা টিম	টা: ৫০,০০০ × ২ মাস	১,০০,০০০/-
১. গবেষণার দলনেতা	টা: ৫০,০০০ × ২মাস	১,০০,০০০/-
২. গবেষণা উপদেষ্টা	টা: ২৫,০০০ × ৩ × ২ মাস	১,৫০,০০০/-
৩. তিনজন গবেষণা সহকারী	টা: ৫০০০ × ২মাস	১০,০০০/-
৪. একজন কম্পিউটার অপারেটর	টা: ৩০,০০০	৩০,০০০/-
৫. PRA প্রণয়ন		
	মোট	**৩,৯০,০০০/-**
খ) উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম :		
১. তিনজন উপাত্ত সংগ্রকারী	টা: ২০,০০০ × ৩ জন	৬০,০০০/-
২. দুইজন উপাত্ত সারণিকারক	টা: ১৫,০০০ × ২ জন	৩০,০০০/-
৩. টিএ ও ডিএ (৬ জন)	টা : ১৫,০০০ × ৬ জন	৯০,০০০/-
	মোট	**১,৮০,০০০/-**

গ) অভিমতপত্র, প্রশ্নোত্তরিকা, প্রাক মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাকরণ		
১. অভিমত পত্র, প্রশ্নোত্তরিকা, সাক্ষাৎকার পত্র ও FGD/PRA সিডিউল প্রণয়ন	টা: ৫,০০০×২	১০,০০০/-
২. Stationary, Accessories, Questionnaire, Printing, Binding	--	৪০,০০০/- ২০,০০০/-
৩. উপাত্ত বিশ্লেষক	টা: ১০,০০০×২ জন	১০,০০০/-
৪. সেমিনার	টা: ১০,০০০/-	৩০,০০০/-
৫. খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি, ছবি, নকশাসহ বাঁধাই খরচ	টা: ৩০,০০০/-	২০,০০০/-
৬. বিবিধ ও অদৃশ্য খরচ	--	
	মোট	১,৩০,০০০/-

উপসংহার (Conclusion)

এ পর্যায়ে গবেষক তার গবেষণার ফলাফল যুক্তি ও প্রমাণসহ উপস্থাপন করে গবেষণার একটি ছোট সারাংশ দিবেন তার গবেষণা সম্পর্কে।

গ্রন্থপঞ্জি (References)

গ্রন্থপঞ্জি যে কোনো কোনো গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গবেষক তার গবেষণায় যে সকল বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী অথবা অন্য কোনো গবেষণাপত্র বা থিসিস ইত্যাদি গবেষণার জন্য ব্যবহার বা পর্যালোচনা করে থাকেন তার একটি তালিকা গবেষণা প্রস্তাবের শেষে উপস্থাপন করবেন। এই তালিকাকেই গ্রন্থপঞ্জি বলা হয়ে থাকে। এটি মূল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবেই স্বীকৃত। এই গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বিষয় বা রীতি মেনে উপস্থাপন করতে হয়। যেমন– বই বা গবেষণা প্রবন্ধের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার সাল ইত্যাদি তথ্যগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। গবেষক তার গ্রন্থপঞ্জির জন্য APA (American Psychological Association) বা Harvard-এর রীতি কিংবা অন্যকোন রীতি অনুসরণ করতে পারেন।

গবেষণার নৈতিকতা (Ethics in Research)

গবেষণা পরিকল্পনার পর যে বিষয়টি একজন গবেষককে চিন্তা করতে হয় তা হলো নৈতিকতা। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে গবেষককে এই নৈতিকতা অনুসরণ করতে হয়। যেমন– গবেষণার অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, নমুনা নির্বাচন, উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, গবেষণার ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষককে নৈতিকতার দিকটিতে লক্ষ্য রাখতে হয়। যারা গবেষণার কাজে অংশগ্রহণ করবেন বা গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত হবেন তাঁদের প্রতি গবেষকের সঠিক আচরণকে গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতা বলে (Saunder *et al.*, ২০০০: পৃঃ ১৩০; লেখক কর্তৃক অনুবাদকৃত)। Wells (১৯৯৪: পৃঃ ২৮৪)-এর মতে, শাব্দিকভাবে নৈতিকতা (ethics) হলো academic কার্যকলাপএবং গবেষণা পরিচালনার সঠিক আচরণের ধারা (লেখক কর্তৃক অনুবাদকৃত)। গবেষণার কাজে এই সঠিক আচরণের ধারা বা নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গবেষক হিসেবে আমাদের আচরণের সঠিকতা বা গ্রহণযোগ্যতা বৃহত্তর সামাজিক আচরণিক আদর্শ বা নর্ম দ্বারা হয়ে থাকে (Wells, ১৯৯৪)। কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তিকে যে ধরনের আচরণ করা উচিত তাঁদের সামাজিক নর্ম বলা হয় (Robson ১৯৯৩ : Saunder *et al.*, ২০০০ হতে উদৃত)। গবেষণার নৈতিকতা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ গবেষককে তার গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়। গবেষককে লক্ষ্য রাখতে হয় তার গবেষণার কারণে যেন কারো কোনোরূপ শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি না হয় কিংবা গবেষণার ফলাফল বা তথ্য দ্বারা কাউকে যেন ছোট করা না হয়। সে কারণে একজন গবেষকের তার গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ধারা (Code of ethics) মেনে চলতে হয়। নৈতিকতার এই ধারা গবেষককে কতকগুলো নীতি বা প্রক্রিয়ার নির্ধারণ করে দেয় যা অনুসরণ করে গবেষক তার গবেষণাটি পরিচালনা করবেন। ১৯৯২ সনে The British Educational Research Association (BERA)শিক্ষামূলক গবেষণার জন্যনৈতিক নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে। একজন শিক্ষক-গবেষক হিসেবে অন্য গবেষকদের সাথেগবেষণার জন্য নিয়ম-নীতি, বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে মত বিনিময় করা উচিত।

গবেষণার নৈতিকতা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

গবেষণা পরিচালনার সময় গবেষককে নৈতিকতা সংক্রান্ত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। এরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণবিষয় হলো (Saunders *et.al*, 2000: পৃ. ১৩২;)।

- গবেষণায় প্রকৃত এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা
- ঐচ্ছিক বা সেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ এবং গবেষণা প্রক্রিয়া হতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার অধিকার।
- অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি এবং সম্ভাব্য deception বা অংশগ্রহণের ছলনা।
- অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তাদের নাম প্রকাশ না করা বা অংশগ্রহণকারীর পরিচয় গোপন রাখা।
- তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়ার প্রতি অংশগ্রহণকারী প্রতিক্রিয়া অংশগ্রহণকারীদের উপর প্রাপ্ত উপাত্তের ব্যবহার, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অনুসরণকৃত প্রক্রিয়ার প্রভাব।
- গবেষকের আচরণ এবং নৈর্ব্যক্তিকতা।

তাই বুঝায় যাচ্ছে যে, গবেষণা যেহেতু নৈতিকভাবে সংবেদনশীল সেক্ষেত্রে গবেষককে উপরের বিষয়গুলো বিবেচনা করে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

গবেষণার নক্সা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি (access) সংক্রান্ত নৈতিকতা

যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে নক্সা প্রণয়নের সময় থেকেই নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। গবেষণার নৈতিকতা সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলো (Guideline) বিবেচনা করে গবেষকের উচিত হবে তার গবেষণা পরিচালনা করা। কোনো কারণে নৈতিকতা মানা সম্ভব না হলে গবেষণা কৌশল বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে গবেষক তার গবেষণার পরিকল্পনা করবেন। উদাহরণস্বরূপ, তার গবেষণায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চান সেক্ষেত্রে তাকে গবেষণা পরিকল্পনার শুরুতেই চিন্তা করতে হবে নৈতিকতা বজায় রেখে তার পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে মনে হলে গবেষক অন্য পদ্ধতি ব্যবহারের চিন্তা করতে পারেন। গবেষণার একটিগুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি। গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য গবেষণার নমুনা বা অংশগ্রহণকারীদের উপর গবেষক কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না (Robson, ১৯৯৩)। গবেষককে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে গবেষণার অংশগ্রহণ করার কিংবা তা প্রত্যাখান করার। শুধু অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি নিলেই হবে না, তাদের সাথে সময় ও স্থান ঠিক করে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক অগ্রসর হবেন। গবেষক তার নিজের সময়মতো গবেষণা ক্ষেত্রে যেতে পারেন না। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে গবেষকের সম্মান দিতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি লাভ খুব সহজ ব্যাপার নয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি লাভের জন্য গবেষককে গবেষণার উদ্দেশ্য অর্থাৎ কি নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন, কেন করছেন–তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। এমনকি তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে, এমনকি তাদের সব রকম তথ্য গোপন রাখা হবে- এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৈতিকতা

এক্ষেত্রে নৈতিকতা হলো অংশগ্রহণকারীর অধিকার সংক্রান্ত। অংশগ্রহণকারী গবেষক অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নাকি ইচ্ছুক নয়– সে ব্যাপারই নয়। অনেক সময় গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীর জন্য সংবেদনশীল হতে পারে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী যদি গবেষণা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে চান তবে তা গবেষককে মেনে নিতে হবে। গুণগত (Qualitative) গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে এধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার কিংবা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এধরনের নৈতিকতার বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল। অনেকসময় গবেষণার জন্য অংশগ্রহণকারীদের না জানিয়ে পর্যবেক্ষণ এর প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষককে অংশগ্রহণকারীর তথ্যের গোপনীয়তা এবং নাম প্রকাশ না করার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করবেন তাদের অনুমতি নিয়ে তাকে কাজটি শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রেও তাকে প্রতিষ্ঠানের নাম ও তথ্য গোপন রাখার নিশ্চয়তা দিতে হবে। তবে কোনো কারণে যদি প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় তবে সেটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১. গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে কী বুঝায়?
২. একটি গবেষণার প্রস্তাব কাঠামোতে অনুসৃত ধাপগুলো উল্লেখ করুন।
৩. গবেষণা সমস্যা বলতে কী বুঝেন?
৪. গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামোটি লিখুন।
৫. কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে যে কাঠামো বা ধাপ অনুসরণ করা হয় তা উল্লেখ করুন।
৬. গবেষণার নৈতিকতা বলতে কী বুঝায়?
৭. গ্রন্থপঞ্জি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কীভাবে একজন গবেষণার ধারণা লাভ করতে পারেন? বর্ণনা করুন।
২. গবেষণার প্রস্তাবনা গঠনের সময় গবেষককে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে? উল্লেখ করুন।
৩. গবেষণা সমস্যা বলতে কী বুঝেন? গবেষণা সমস্যার নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্য করুন।
৪. গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামোটি লিখুন।
৫. কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে যে কাঠামো বা ধাপ অনুসরণ করা হয় তা উল্লেখ করুন।
৬. গবেষণা প্রস্তাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। গবেষণা প্রস্তাবনার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিন।
৭. গবেষণা প্রস্তাবে গবেষণা পদ্ধতির আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।
৮. গ্রন্থপঞ্জি কী? গ্রন্থপঞ্জি কীভাবে লিখতে হয়?
৯. গবেষণায় নৈতিকতা কীভাবে রক্ষা করা যায়?

গ্রন্থপঞ্জি

- আহামেদ, আ.আ. আ. (২০০৫). শিক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি, ঢাকা।
- হোসেন, ম., আক্তার, সে., জিবরান, শো., আখতার, লা. এবং ইসলাম, জ. (২০০৯). কর্মসহায়ক গবেষণা কোর্স, কোডঃ EDBN ২৩১৭, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- Buzan, T. with Buzan, B. (1995). *The Mind Map Book* (revised edn), London, BBC Books.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches.Sage Publications, London.
- Furseth, I., & Everett, E. L. (2013). Doing your master's dissertation: From start to finish. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ghauri. P., GrØnhaug, K. and Kristianslund, I. (1995). *Research Methods in Business Studies*, Harlow, Prentice Hall.
- Gill, J. andJohnson, P. (1997). *Research Methods for Managers* (2nd edn), London, Paul Chapman.
- Moody, P. E. (1983). *Decision Making: Proven Methods for Better Decisions*, Maidenhead, McGraw-Hill.
- Robson, C. (1993). Resal World Research, Oxford, Blackwell.
- Saunders, M. N.K., Lewis, P. and Thornhill, A. (2000), Research Methods for Business Students.Prentice Hall, England.
- Saunders, M.N.K. and Lewis, P. (1997). 'Great ideas and blind alleys? A review of the literature on starting research', *Management Learning*, 28:3, 283-99.
- Sharp, J. and Howard, K. (1996). *The Management of a Student Research Project* (2nd edn) Aldershot, Gower.
- Smith, N.C. and Dainty, P. (1991). *The Management Research Handbook*, London, Routledge.
- Wells, P. (1994). Ethics in Business and management research, in Wass, V. J. and Wells, P. E.(eds), *Principles and Practice in Business and Management Research*, Aldershot, Dartmouth, pp.277-97.

ইউনিট-৮ : গবেষণা প্রতিবেদন (Research Report)

যে কোনো গবেষণার সর্বশেষ পর্যায়টি হলো গবেষণার প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং উপস্থাপন। কোনো গবেষণাই কাজে লাগে না যতক্ষণ পর্যন্ত না গবেষক তার গবেষণার প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন করেন। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমেই গবেষক আগ্রহী পাঠক বা গবেষকদের কাছে তার গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল পৌঁছে দেন। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি কার্যক্রম যুক্তিসহকারে গবেষক এই প্রতিবেদনে তুলে ধরেন। কী সমস্যা ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণাটি শুরু করা হয়েছিল, গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা, কী প্রক্রিয়ায় গবেষণাটি করা হয়েছিল, গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল, ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি সকল বিষয় গবেষণার প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়। গবেষণার প্রতিবেদনের একটি সাধারণ কাঠামো অনুসরণ করে গবেষক তার গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এই ইউনিটে গবেষণা প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৮.১: গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো
৮.২: গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

৮.১ : গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো (Format of a Research Report)

গবেষণা কর্মের সর্বশেষ পর্যায়টি হলো গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো অনুসরণ করে গবেষণার প্রতিবেদন লিখন। গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমেই গবেষক তার গবেষণার প্রতিটি কাজ উপস্থাপন করেন। গবেষক যদি তার কোনো ডিগ্রির (যেমন-মাস্টার্স, এমফিল, বা পিএইচডি) অংশ হিসেবে গবেষণাটি করে থাকেন তবে তার গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত গবেষণা প্রতিবেদনে লিখে তার প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে জমা দেন। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানের হয়ে গবেষক গবেষণাটি পরিচালনা করলে তার সর্বশেষ পর্যায়ের কাজটি অর্থাৎ গবেষণার প্রতিবেদন লিখে তা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরনিকট জমা দেন। অনেক সময় গবেষক তার নিজের আগ্রহে কোনো গবেষণা করে তার প্রতিবেদন লিখেন এবং গবেষণার প্রতিবেদন নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। কারণ গবেষণার ফলাফল গবেষক অন্যকেও জানাতে চান। আগ্রহী গবেষক এবং পাঠকদের কাছে গবেষক তাঁর গবেষণার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া, ফলাফল এবং প্রাপ্ত ফলাফল হতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। গবেষক তার গবেষণা থেকে যে মূল্যবান তথ্যই পান না কেন এসব তথ্য যদি তিনি কাউকে না জানান তবে গবেষণার কোনো গুরুত্বই থাকে না এবং জ্ঞানের প্রসারও ঘটে না। গবেষণার প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য আগ্রহী গবেষক এবং পাঠকদের কাছে সহজ ও প্রাঞ্জলভাষায় উপস্থাপন করা । এছাড়া অন্যান্য গবেষকরা গবেষণার প্রতিবেদন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং গবেষণার তাত্ত্বিক ধারণা লাভ করতে পারেন। গবেষণার প্রতিবেদন লিখার সময় গবেষককে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল, বস্তুনিষ্ঠ এবং বিশ্লেষণমূলক হয়। আর তথ্যবহুল, বস্তুনিষ্ঠ এবং বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন লিখনের জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেদন কাঠামো। গবেষণা প্রতিবেদন লিখার সময় কতকগুলো সাধারণ ধাপ কাঠামো অনুসরণ করার কথা বিভিন্ন গবেষক ও লেখক নির্দেশ করেছেন (Robson, 1993, Saunders et al. 2000)। গবেষণা প্রতিবেদন লিখার যে সাধারণ কাঠামো অনুসরণ করা হয় তা হলো–

- সারসংক্ষেপ (Abstract)
- ভূমিকা (Introduction)
- সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review)
- গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)
- ফলাফল (Result)
- উপসংহার (Conclusion)
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (Reference)
- পরিশিষ্ট (Appendix)

তবে গবেষককে উপরের কাঠামোই যে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গবেষণার এই সাধারণ কাঠামোকে আবার উপভাগে ভাগ করে কতকগুলো অধ্যায়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন (Phillip এবং Pugh, ১৯৯৪)। অর্থাৎ গবেষক যেভাবে চান সেভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এক্ষেত্রে গবেষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গবেষণা প্রতিবেদনের প্রতিটি ধাপ তার রির্পোটে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ থাকে। আসলে গবেষণার প্রতিবেদনকে গবেষণা প্রস্তাবের একটি বর্ধিত রূপ বলা যায়। গবেষণা প্রস্তাবে গবেষক কী, কেন এবং কীভাবে গবেষণাটি করতে চাচ্ছেন তার বর্ণনা থাকে। অন্যদিকে গবেষক তার গবেষণাটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেন তার সাথে গবেষণার পদ্ধতি, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ, ফলাফল, সিদ্ধান্ত, গবেষণার জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি এবং অন্যান্য তথ্যসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র উপস্থাপনসহ বিস্তারিত বর্ণনাই হলো গবেষণা প্রতিবেদন। গবেষণা কাঠামোর ধাপগুলো উপভাগে বিভক্ত করে গবেষণার প্রতিবেদন যেভাবে লিখা যায় তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো (আহামেদ, ২০০৫)।

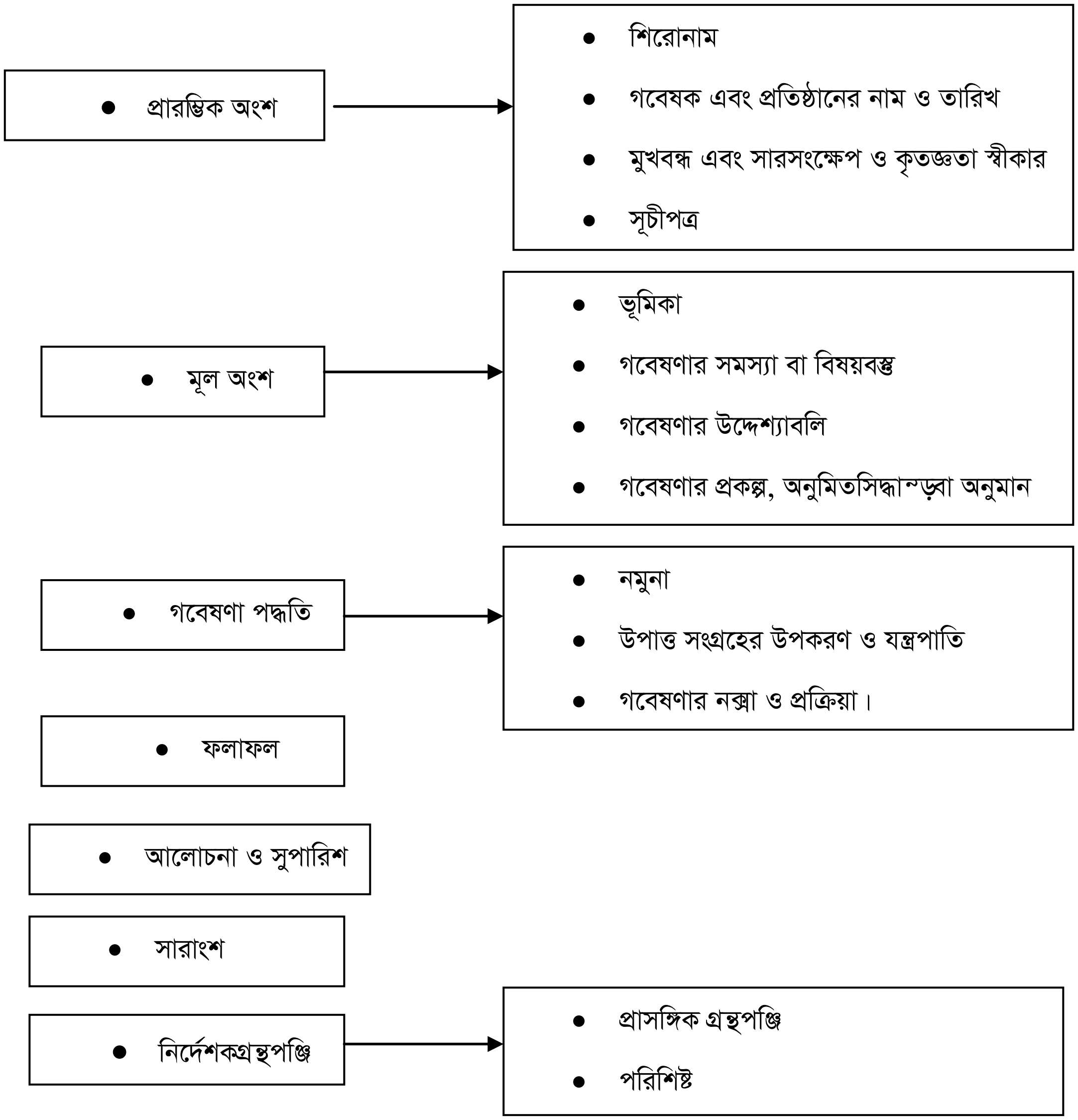
● প্রারম্ভিক অংশ
● শিরোনাম
● গবেষক এবং প্রতিষ্ঠানের নাম ও তারিখ
● মুখবন্ধ এবং সারসংক্ষেপ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার
● সূচীপত্র
● মূল অংশ
● ভূমিকা
● গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু
● গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি
● গবেষণার প্রকল্প, অনুমিতসিদ্ধান্ত বা অনুমান
● গবেষণা পদ্ধতি
● নমুনা
● উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি
● গবেষণার নক্সা ও প্রক্রিয়া।
● ফলাফল
● আলোচনা ও সুপারিশ
● সারাংশ
● নির্দেশকগ্রন্থপঞ্জি
● প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি
● পরিশিষ্ট

চিত্র-১- গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো

সাধারণভাবে যে কোনো গবেষণার প্রতিবেদন লিখার ক্ষেত্রে উপরের কাঠামোটি ব্যবহার করা যায়। উপরের কাঠামোর সাথে আর সে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সেগুলো হলো-

- গবেষণার তাৎপর্য
- গবেষণার পরিসর
- গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এছাড়া গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিবেদন কাঠামোতে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- গুণগত (Qualitative) গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিবেদন কাঠামোটি একটু ভিন্নরূপ। গুণগত গবেষণার প্রতিবেদনের জন্য যে কাঠামোটিঅনুসরণ করা যায় সেটি নিম্নরূপ :

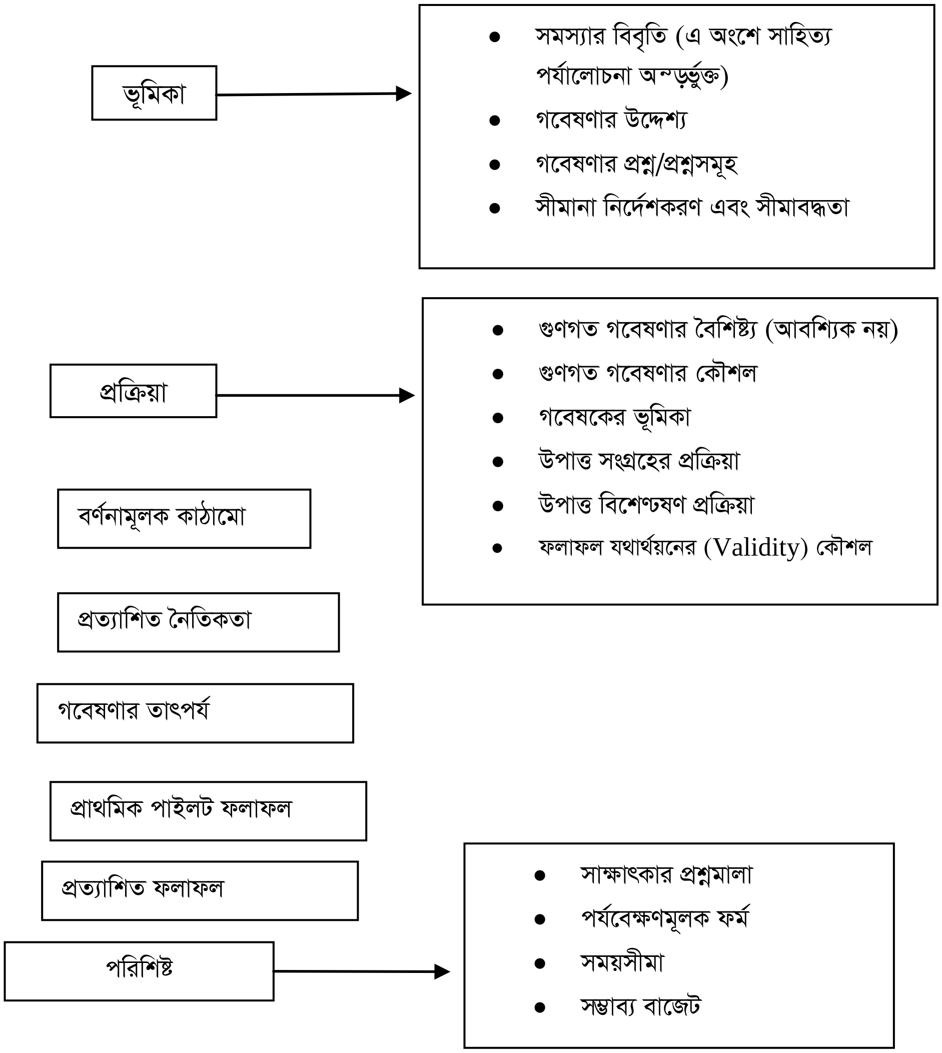
ভূমিকা
● সমস্যার বিবৃতি (এ অংশে সাহিত্য পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত)
● গবেষণার উদ্দেশ্য
● গবেষণার প্রশ্ন/প্রশ্নসমূহ
● সীমানা নির্দেশকরণ এবং সীমাবদ্ধতা
প্রক্রিয়া
● গুণগত গবেষণার বৈশিষ্ট্য (আবশ্যিক নয়)
● গুণগত গবেষণার কৌশল
● গবেষকের ভূমিকা
● উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া
● উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া
● ফলাফল যথার্থয়নের (Validity) কৌশল
বর্ণনামূলক কাঠামো
প্রত্যাশিত নৈতিকতা
গবেষণার তাৎপর্য
প্রাথমিক পাইলট ফলাফল
প্রত্যাশিত ফলাফল
পরিশিষ্ট
● সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা
● পর্যবেক্ষণমূলক ফর্ম
● সময়সীমা
● সম্ভাব্য বাজেট

চিত্র-২ : গুণগতগবেষণার প্রস্তাব কাঠামো [**উৎস** : Creswell, ২০০৭: পৃ. ৪৭-৪৮]

কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামোর (চিত্র-১) সাথে গবেষণার আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে আরো অতিরিক্ত ধাপ সংযুক্ত হয়ে থাকে। যেহেতু কর্মসহায়ক গবেষণা কয়েকটি চক্র বা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয় সেকারণে

প্রতিটি চক্রের বিস্তারিত বর্ণনা গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে চিত্র-১-এর ধাপগুলোর সাথে আরো যে বিষয়গুলোর বর্ণনা আবশ্যক সেগুলো হলো–

প্রথম চক্র : ● সমস্যা চিহ্নিতকরণ ● সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান ● সম্ভাব্য সমাধানের উপায় পরিকল্পনাকরণ ● কার্য সম্পাদন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ ● প্রতিফলন
দ্বিতীয় চক্র : ● পুনঃচিহ্নিত সমস্যা ● সমস্যার কারণ অনুমান এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান ● সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নিরূপণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ● কার্য সম্পাদন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ ● প্রতিফলন

৮.২ : গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ (Preparation of Research Report)

কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়। গবেষক তার নির্বাচিত বিষয়ে গবেষণা অনুসন্ধানের পর সংগৃহীত তথ্য, তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্তসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনাকেই বলা হয় গবেষণা প্রতিবেদন। গবেষক তাঁর গবেষণার তথ্য, তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং সামগ্রিক বিষয় আগ্রহী পাঠক ও গবেষকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তার গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। গবেষণা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে গবেষক তাঁর গবেষণার প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকেন। অর্থাৎ গবেষক গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বা উপাত্ত প্রতিক্রিয়াজাতকরণের পরই গবেষণার প্রতিবেদন লিখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এখানে গবেষক গবেষণার শিরোনাম হতে শুরু করে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, তথ্যসংগ্রহের পন্থা, নমুনা (অর্থাৎ কাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে), নমুনায়নের কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল ও ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেন। গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য গবেষক গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামোর ধাপগুলো অনুসরণ করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকেন। গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের ধাপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

শিরোনামের পাতা (Title Page)

গবেষণার শিরোনাম দিয়ে প্রতিবেদনের প্রথম পাতা শুরু হয়। যাকে বলা হয় শিরোনামের পাতা। শিরোনামের পাতা প্রতিষ্ঠানের রীতি বা নিয়ম অনুসরণ করে লিখতে হয়। তবে শিরোনামের পাতায় মোটামুটিভাবে যে সাধারণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তা হলো-

- গবেষণার বিষয়বস্তুর নাম বা শিরোনাম
- লেখকের নাম
- কোন কোর্স বা বিষয়ের অংশ হিসাবে প্রতিবেদনটি লিখা হয়েছে তা উল্লেখ করা।
- যে প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিবেদনটি পেশ করা হয় তার নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
- পরিশেষে প্রতিবেদন পেশের তারিখ।

পিএইচ.ডি বা এমফিল বা মাস্টার্স এর গবেষণা প্রতিবেদন হলে যদি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মনোগ্রাম থাকে তাহলে সেই মনোগ্রামটি কভার পৃষ্ঠায় ব্যবহার করা উচিত। প্রতিবেদনটি গবেষক ইংরেজি বা বংলায় লিখতে পারেন। যদি প্রতিবেদনটি বাংলায় হয় সেক্ষেত্রে বড় অক্ষরে শিরোনামটি লিখতে হবে, অন্যদিকে, ইংরেজিতে লিখা হলে শিরোনামটি সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে লেখা উচিৎ। গবেষণার শিরোনামটি সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, শিরোনামটি থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যটি অনুমান করা যায়। নিচে গবেষণার শিরোনামের পাতার একটি নমুনা দেখানো হলো।

উৎসর্গের পাতা (Acknowledgement Page)

গবেষক যদি তাঁর গবেষণার কাজটি কারো নামে উৎসর্গ করতে চান সেক্ষেত্রে তিনি শিরোনামের পরবর্তী পৃষ্ঠায় কার উদ্দেশ্যে তার গবেষণার কাজটি উৎসর্গ করতে চান তা উল্লেখ করবেন। উদাহরণস্বরূপ : নিম্নে উৎসর্গের নমুনা উপস্থাপন করা হলো

This work is dedicated to my respected and lovely parents
অথবা
আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মার উদ্দেশ্যে লেখাটি উৎসর্গ করা হলো যারা আমার সকল প্রেরণার উৎস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgements)

এ অংশে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা যেমন– কেন গবেষক বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছেন, গবেষণাটি পরিচালনাকালীন সময়ে যেসকল ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গবেষকের প্রয়োজন হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার এখানে তুলে ধরবেন। যেমন– গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের সহয়তা ও উপদেশ-নির্দেশনা, উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তাকারী, যেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (যেমন– বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলে শিক্ষার্থীদের, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। এক কথায় বলা যায়, গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে যেখান থেকে বা যার কাছ থেকে গবেষক সহায়তা পেয়েছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রতিবেদনের এ অংশে ব্যক্ত করবেন।

সূচিপত্র (Table of Contents)

প্রতিবেদনের কোনো অধ্যায় কোনো পাতায় রয়েছে তার পৃষ্ঠা নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা হয় সূচিপত্র বা List of Contents-এ। অর্থাৎ সূচিপত্র হলো গবেষণার মূল বিষয়ের তালিকা। সূচিপত্রে উল্লিখিত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যার সাথে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের শিরোনাম ও পৃষ্ঠার মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। সূচিপত্রের পর গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চার্ট এবং টেবিলের তালিকা পৃথকভাবে টেবিলের তালিকা (List of Table) এবং চিত্রের তালিকা (List of Figure) নামে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক ।

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

সার-সংক্ষেপ অংশে গবেষণার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা বা উপস্থাপন করা হয় যাতে গবেষণার সার-সংক্ষেপ পাঠ করে গবেষণা সম্পর্কে অন্য গবেষক বা আগ্রহী পাঠক সহজে বুঝতে পারেন। সার-সংক্ষেপের আকার সাধারণত প্রতিবেদনের ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- গবেষণা প্রবন্ধের জন্য সার-সংক্ষেপ ১৫০ শব্দের মধ্যে হলে ভালো হয়। তবে যে কোনো প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ২০০ থেকে ৫০০ শব্দের মধ্যে হলেই ভালো হয়। Dissertation বা থিসিসের ক্ষেত্রে ৫০০ শব্দের বেশি হলে কোনো অসুবিধা নেই। সার-সংক্ষেপের সাথে গবেষণা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ বা Keywords অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাকে বলা হয় পদসূচী সার বা Term List abstract।

ভূমিকা (Introduction)

প্রতিবেদনের এ অংশে গবেষক তার গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণনা করবেন। বিষয়টি বর্ণনার পর গবেষক কেন বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তা তুলে ধরবেন। এখানে গবেষক গবেষণার তাত্ত্বিক ধারণা বা গবেষণার প্রেক্ষিত সাধারণ ভাষায় উপস্থাপনা করবেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য বা প্রবন্ধ এ অংশে পর্যালোচনা করবেন। গবেষণা পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় গবেষণাটির বিষয় সম্পর্কে গবেষকের কতটা গভীর জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণার তাত্ত্বিক বা ধারণাগত কাঠামো (Theoritical or conceptual framework) পেয়ে থাকেন। সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শুধু গবেষক তার গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোই উপস্থাপন করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় যাতে এখানে অন্তর্ভুক্ত না হয় সেদিকে গবেষককে খেয়াল রাখতে হবে।

সমস্যার বিবৃতি (Statement of Problem)

প্রতিবেদনের এই অংশে যে সমস্যা কেন্দ্র করে গবেষণাটি পরিচালনা করা হচ্ছে তার উল্লেখ করতে হবে। সমস্যাটি বিবৃতির আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

সমস্যার বিবৃতি উল্লেখ করার পর কী উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য; এ অংশে দু'টো উদ্দেশ্যই সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে যা এ উদ্দেশ্যগুলো পড়ে সহজেই বুঝা যায় গবেষণাটির মাধ্যমে গবেষক কী অনুসন্ধান করতে চাচ্ছেন।

গবেষণা পরিচালনার যৌক্তিকতা ও পরিসর (Rationale and Limitation of the Study)

এ পর্যায়ে গবেষক কী কারণে গবেষণা করতে চাচ্ছেন, এর গুরুত্ব- সেসম্পর্কে যুক্তি দিয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বা তাৎপর্য তুলে ধরবেন। এছাড়া কাদের জন্য এটি করা হচ্ছে বা কারা এ গবেষণার আওতায় রয়েছে তাও যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

গবেষণা প্রতিবেদনের এই পর্যায়ে গবেষককে গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হয়। একজন পাঠক বা গবেষক গবেষণা প্রতিবেদনের এ অংশ পাঠ করেই যাতে বুঝতে পারেন গবেষক তার গবেষণাটি পরিচালনার জন্য কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছেন। গবেষণা পদ্ধতিতে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- গবেষণার ধরন ও নক্সা
- নমুনা এবং নমুনায়ণ কৌশল
- গবেষণা কৌশল (পরিমানগত, গুণগত বা মিশ্র গবেষণা কৌশল)
- গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল
- উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি
- গবেষণার নৈতিক দিক

উপরের প্রতিটি বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষক অবশ্যই তার নির্বাচিত গবেষণার ধরন, নক্সা, নমুনা ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন এবং কেন তিনি উক্ত বিষয়গুলো নির্বাচন করেছেন তা ব্যাখ্যা করবেন। উদাহরণস্বরূপ, গবেষক যদি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জরিপ প্রশ্নমালা ব্যবহার করেন তবে কেন তা ব্যবহার করেছেন সেটি ব্যাখ্যা করে বলে দিবেন। প্রশ্নমালার সাথে সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হলে কেন সাক্ষাৎকার ব্যবহার করেছেন তাও ব্যাখ্যা করতে হবে। একইভাবে নমুনায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে কোনো নমুনায়ন কৌশল ব্যবহার করেছেন এবং কেন করেছেন।

ফলাফল ও আলোচনা (Results and Discussion)

এই অংশে গবেষক তার গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করতে পারেন। গবেষক আলোচনার অংশটি পৃথক অংশেও উপস্থাপন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি ফলাফল অল্প কথায় ব্যক্ত করবেন। কিন্তু ফলাফলের ব্যাখ্যা আলোচনা অংশে বর্ণনা করবেন। এখানে তিনি সাহিত্য পর্যালোচনার কিছু তথ্য তার ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতার যুক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ফলাফল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গবেষক যে বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন তা নিম্নরূপ (Bryman, ২০০৪:পৃ ঃ ৫৫৩)।

- গবেষক শুধুমাত্র ততটুকু ফলাফল উপস্থাপন করবেন যা তার গবেষনার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত।
- গবেষক তার গবেষণা ফলাফলের টেবিল, গ্রাফ বা অন্য ধরনের বিশ্লেষণের প্রধান প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন করবেন। তবে তিনি শুধু ফলাফলের সারমর্ম উপস্থাপন করবেন না। বরং তার টেবিল বা গ্রাফের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরবেন যাতে একজন পাঠক বা গবেষক পড়েই তা নতুন কী তথ্য নির্দেশ করছে সেটি বুঝতে পারেন।
- কোন মতামত ছাড়া ফলাফলের গ্রাফ বা টেবিল উপস্থাপন পরিহার করতে হবে। কারণ ফলাফল থেকে একজন আগ্রহী পাঠক বা গবেষক জানতে চান গবেষক কেন তার ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন।
- পরিমাণগত (Quantitative) ফলাফল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পন্থা ব্যবহার করা উত্তম। যেমন– বিভিন্ন ধরনের চার্ট বা গ্রাফ এবং টেবিলের ব্যবহার।

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনে সাধারণত সারণি, লেখচিত্র, ছবি মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেদনের এ অংশে তথ্য, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র সংযোজন করার সাথে সাথে আলোচনা করা হলে পাঠকের নিকট তথ্য ও ফলাফলের বিভিন্ন দিক বুঝতে সহজ হয়। তবে যদি বড় বড় সারণি, মানচিত্র বা অধিক রেখাচিত্র ব্যবহার করা হলে সেগুলোকে পরিশিষ্টে সংযোজন করলে ভালো হয় এবং এসব তথ্য সম্পর্কিত সারণি, লেখচিত্র পরিশিষ্টের কতো পৃষ্ঠায় রয়েছে তা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, যাতে পাঠক ইচ্ছা করলেই উক্ত পৃষ্ঠায় সারণী বা লেখচিত্রটি দেখতে পারেন।

গবেষণার সুপারিশ (Recommendations)

গবেষণার এ অংশে ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এ অংশে প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিক ও আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ফলাফল কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে সমর্থন করছে কিনা বা না নতুন কোনো তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করে এবং বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানে এ ফলাফল কতটা প্রয়োগযোগ্য সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। অর্জিত ফলাফল গবেষণার কোনো প্রকল্পকে সমর্থন না করলে কি কি সম্ভাব্য কারণে প্রকল্পটি সমর্থিত হয়নি তাও আলোচনা করা হয়। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্নমূখী সুপারিশ এখানে উল্লেখ থাকে। গবেষণার ফলাফল থেকে গবেষণা সমস্যাটির যেসব দিক জানা বা বুঝা সম্ভব হয়নি এবং কোনো কোনো দিক নিয়ে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন, প্রতিবেদনের এ অংশে সে বিষয় নিয়ে সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research Work)

গবেষণাটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোনো ভুল ক্রটি হলে বা গবেষক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হলে তা এ অংশে তুলে ধরবেন এবং গবেষণাটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য। সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিবেন।

উপসংহার (Cnclusion)

এ অনুচ্ছেদে গবেষক তার গবেষণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন। গবেষণার ফলাফলের আলোচনার সময় তিনি তার গবেষণার ফলাফল বাস্তবায়নের (Implementation) দিকটিও তুলে ধরবেন। যাতে একজন পাঠক বা গবেষক সহজেই বুঝতে পারেন কেন গবেষণার ফলাফল তাৎপযপূর্ণ। এছাড়া গবেষক তার গবেষণার সীমাবদ্ধতার কথা পুনবার উল্লেখ করবেন। সবশেষে বিষয়টির উপর আরো গবেষণা করার সুপারিশ বা প্রস্তাব রাখবেন।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography/References/Literature Citations)

Reference হলো পুস্তকের শেষে বা প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত বইয়ের তালিকা, যা হতে গবেষক তার প্রতিবেদনটি লিখতে সাহায্য নিয়েছেন। তথ্য নির্দেশের একটি প্রধান অংশ হলো এই Reference বা গ্রন্থপঞ্জি। গ্রন্থপঞ্জি যে পৃষ্ঠায় সন্নিবেশ করতে হবে তার পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার মাঝামাঝি জায়গায় শুধু গ্রন্থপঞ্জি কথাটি লেখা থাকতে পারে কিংবা যে পাতায় গ্রন্থপঞ্জির তালিকা দেওয়া হবে সেই পাতার শুরুতে এবং মাঝখানে বড় করে গ্রন্থপঞ্জি কথাটি লেখা যায়। ব্যবহৃত তথ্য সূত্রসমূহ বর্ণনানুক্রমিকভাবে বা বর্ণমালা অর্থাৎ A,B...এভাবে সাজাতে হবে। গ্রন্থপঞ্জি লেখার সময় গ্রন্থকারের নাম প্রথমে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থকারের নাম ছাড়াও প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান এবং সন উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জির জন্য আজকাল বিভিন্ন ধরনের স্টাইল ব্যবহৃত হয়, যেমন- APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Chicago/Turabian বা Harbard স্টাইল। তবে গবেষকগণ গবেষণার জন্য সাধারণত APA বা Harbard স্টাইল বেশি ব্যবহার করে থাকে। নিচে উভয় ধরনের গ্রন্থপঞ্জির লেখার স্টাইল নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো।

APAStyle	
বই	Baxter, C. (1997). *Race equality in health care and education.*Philadelphia: Ballière Tindall
প্রবন্ধ	Alibali, M. W. (1999). How children change their minds: Strategy change can be gradual or abrupt. *Developmental Psychology, 35,*127-145.
Harvard Style	
বই	Doss, G., 2003, IS project management handbook, Aspen Publishers, New York.
প্রবন্ধ	Lamb, R. & Kling, R., 2003, 'Reconceptualizing users as social actors in information systems research', MIS Quarterly 27(2), 197.

গ্রন্থপঞ্জি লেখার স্টাইল বা ধরন

পরিশিষ্ট(Annexure/Appendix)

পরিশিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। Appendix বা পরিশিষ্টে প্রতিবেদনের মধ্যে লিখিত বিভিন্ন দলিল পত্রাদি সংযোজন করতে হয়। যেমন– গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তরিকা যা প্রতিবেদনে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু পাঠক বা গবেষকগণ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রশ্নত্তোরিকাজানতে আগ্রহী হতে পারে। তাই পরিশিষ্ট হিসাবে প্রতিবেদনে, মানচিত্র, নির্ঘণ্ট, জীবন ইতিহাস বা কেসস্টাডি, ছবি ইত্যাদি পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়। প্রতিটি বিষয় বা একই প্রকারের বিষয়গুলো ভাগ করে পরিশিষ্ট-ক, পরিশিষ্ট-খ এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়। যেমন– পরিশিষ্ট-ক ঃ প্রশ্নত্তোরিকা, পরিশিষ্ট-খ ঃ মানচিত্র- এভাবে উপস্থাপন করা হয়।

পরিশিষ্ট উপস্থাপনের পর প্রতিবেদনের লিখিত অংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন– প্রতিবেদনের প্রতি পাতার নম্বরায়ন করা এবং সর্বশেষে বাঁধাই এর কাজ। বাধাঁই দু'ভাবে করা যায়, যেমন- হার্ড বাঁধাই ও স্পাইরাল; এটি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম বা রীতির উপর সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে গবেষক তার প্রতিবেদনটি বাঁধাই করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জমা দিবেন এবং এপর্যায়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতি কাজটির পরিপূর্ণভাবে সমাপ্তি ঘটে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১. গবেষণা প্রতিবেদন কী?
২. গবেষণা প্রতিবেদনের সাধারণ কাঠামোর নমুনাটি লিখুন।
৩. গ্রন্থপঞ্জি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

৪. গুণগত গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামো কীভাবে প্রতিবেদনের সাধারণ কাঠামো হতে ভিন্ন? বর্ণনা করুন।
৫. একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য যে ধাপ অনুসরণ করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৬. প্রতিবেদনের গবেষণা পদ্ধতি অংশে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন।
৭. গ্রন্থপঞ্জি কী? গ্রন্থপঞ্জি লিখার একটি স্টাইল উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

তথ্যসূত্র :

- আহামেদ, আ.আ. আ. (২০০৫). শিক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি, ঢাকা।
- Bryman, A. (2004). Social Research Method (2ndEds), Oxford, University Press.
- Phillip, E. and Pugh, D. (1994). How to Get a PhD (2nd edn), Buckingham, Open University Press.
- Robson, C. (1993). Resal World Research, Oxford, Blackwell.
- Saunders, M. N.K., Lewis, P. and Thornhill, A. (2000), Research Methods for Business Students, Prentice Hall, England.